একটি
THE BUSINESS STANDARD
প্রকাশনা

ইজেল

১৩ পৌষ ১৪৩১ | সংখ্যা ১৬৩
SATURDAY 28 DECEMBER, 2024

পাইরেটস!

জলদস্যু পাঁচালী

বিপৎসংকুল সোমালি জলসীমা ও জলদস্যুদের শিকার যত জাহাজ!

ন্যাটো কমান্ডের অধীনে কাজ করা ডাচ নৌবাহিনী দ্বারা বন্দী সন্দেহভাজন সোমালি জলদস্যুরা। ছবি: জোসেফ ওকাঙ্গা/ রয়টার্স

কয়লা নিয়ে আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিক থেকে দুবাইয়ের দিকে যাওয়ার সময় ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুর কবলে পড়েছে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ। এ সময় জাহাজটিতে ২৩ জন ক্রু ছিলেন।

সোমালিয়ার জলদস্যুদের জাহাজে হামলা ও ছিনতাইয়ের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে সোমালি গৃহযুদ্ধের শুরু থেকে সোমালিয়ার উপকূলের জলদস্যুরা আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০০৫ সাল থেকে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা জলদস্যুদের তৎপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

প্রাথমিকভাবে ২০০০ সালের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক মাছ ধরার জাহাজগুলোয় হামলা চালালেও সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় (২০০৬-২০০৯) জলদস্যুরা আন্তর্জাতিক শিপিংয়ে হামলা চালানো শুরু করে।

২০১২ সালে সোমালিয়ার সরকারের তথ্য অনুযায়ী, জলদস্যুরা প্রাথমিকভাবে দেশের কেন্দ্রীয় অংশের গালমুডুগ অঞ্চল থেকে হামলা ও ছিনতাই পরিচালনা করত। দেশটির আঞ্চলিক প্রশাসন একটি বড় জলদস্যুতাবিরোধী অভিযান শুরু করার পর এবং মেরিটাইম পুলিশ ফোর্স (পিএমপিএফ) প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগপর্যন্ত সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রদেশ পুন্টল্যান্ডে অবস্থিত বন্দরগুলো থেকে সমুদ্রে হামলা চালাত জলদস্যুরা।

ওশেনস বিয়ন্ড পাইরেসির (ওবিপি) তথ্য অনুসারে, জলদস্যুদের কারণে পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি শিপমেন্ট খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে বছরে আনুমানিক ৬.৬ থেকে ৬.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে।

সোমালি জলদস্যুদের জাহাজে হামলা এবং ছিনতাইয়ের কিছু ঘটনা

২০০৮ সালে সোমালি জলদস্যুরা ১১১টি হামলা চালিয়েছিল, যার মধ্যে ৪২টি সফল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় জলদস্যুরা ডেনমার্কের মালিকানাধীন রাশিয়ান টাগবোট এমভি স্বিতজার কোরসাকভ ছিনতাই করেছিল। জাহাজটি পুন্টল্যান্ডের আইল শহরের কাছে আটকে রাখা হয়েছিল। আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কার্নি ৭ লাখ মার্কিন ডলারের মুক্তিপণের বিনিময়ে ১৮ মার্চ ছয়জন ক্রুসহ জাহাজটি উদ্ধার করে।

২০০৯ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসেই জাহাজে হামলার হার ২০০৮ সালের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি ছিল। ২০০৯ সালের মার্চ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৭৯টি আক্রমণ চালিয়ে সোমালি জলদস্যুরা ২১টিতে সফল হয়েছিল। এই আক্রমণগুলোর বেশির ভাগই এডেন উপসাগরে ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে সোমালি জলদস্যুরা তাদের হামলার পরিসর বাড়িয়ে ভারত মহাসাগরের কেনিয়ার উপকূল থেকে দক্ষিণের জাহাজগুলোয় হামলা চালানো শুরু করে।

২০১০ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় উপকূল থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার (১৮৫ মাইল) দূরে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কাছে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ *এরপর পৃষ্ঠা ১২*

১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে সোমালি গৃহযুদ্ধের শুরু থেকে সোমালিয়ার উপকূলের জলদস্যুরা আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছবি: এপি

২০০৮ সালে সোমালি জলদস্যুরা ১১১টি হামলা চালিয়েছিল, যার মধ্যে ৪২টি সফল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় জলদস্যুরা ডেনমার্কের মালিকানাধীন রাশিয়ান টাগবোট এমভি স্বিতজার কোরসাকভ ছিনতাই করেছিল। জাহাজটি পুন্টল্যান্ডের আইল শহরের কাছে আটকে রাখা হয়েছিল।

প্রচ্ছদ: মাহতাব রশীদ

সাপ্তাহিক ইজেল, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর একটি প্রকাশনা, ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০। বিজ্ঞাপন: ০১৭১১৫৪৭০৫০ ✉ tbs.features@gmail.com ⊕ tbsnews.net

চীন সাগরের জলদস্যু।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ‘জলদস্যু প্রজাতন্ত্র’

উত্থান এবং পতনের কথামালা

সৈয়দ মূসা রেজা

১৮ শতকের গোড়ার দিক। বাহামার রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি অঞ্চল জলদস্যু বা পাইরেটদের তৎপরতার কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে। জলদস্যুদের এ দলটিই গোটা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলজুড়ে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাদের তলোয়ারের নিচে কেঁপে ওঠে আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলও। হিস্টোরি এক্সটার প্যাট কিনসেলার বয়ানে উঠে এসেছে সেসব গল্পগাথা।

১৭১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই। রাত। বাহামার নিকষ কালো রাত্রি হঠাৎ করেই আলোকিত হয়ে উঠল। জলদস্যু সরদার কাপ্তান চার্লস ভেইন নিজ জাহাজে আগুন লাগিয়ে তা ঠেলে পাঠিয়ে দিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর দিকে। ওই দিন সকালেই এ জাহাজগুলো নতুন গভর্নর উডস রজার্সকে পাহারা দিয়ে নাসাউতে নিয়ে এসেছে।

ইস্পাতদৃঢ় মনোবলের মানুষ উডস রজার্স। পূর্বজীবনে ছিলেন প্রাইভেটিয়ার। ভাড়াটে নৌসেনা। জলদস্যুদের দমন করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বাহামা থেকে নাসাউতে এসেছেন তিনি। জলদস্যুদের উৎপাতে নাসাউ সাগরপথ দিয়ে চলমান দীর্ঘদিনের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় লাটে উঠতে বসেছে। ভয়াবহ এমন জলদস্যুদের আস্তানাই ছিল ‘জলদস্যু প্রজাতন্ত্র’। রজার্সের আসার ঘটনায় জলদস্যুদের মনে কাঁপন লেগে যায়।

রজার্সের সাহসিকতা এবং নাম বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। দূরবর্তী এই ঔপনিবেশিক ঘাঁটির প্রতি আর চোখ বন্ধ রাখতে পারছিল না ব্রিটিশ সরকার। এবারে তাদের শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিল। বন্দরে একসময় জলদস্যুদের নিশান পতপত করেই উড়ত। এবারে চাপের মুখে পড়তে থাকল তাদের অবাধ আনাগোনা, তৎপরতা।

কুখ্যাত জলদস্যু কাপ্তানদের একটি দলকে সামগ্রিকভাবে ‘ফ্লাইং গ্যাং’ বলা হতো। এক দশকের বেশি সময় ধরে তারা বাহামার গোটা অঞ্চলে নিজেদের দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল। নতুন গভর্নর রজার্স এসেই রাজক্ষমার ঘোষণা শোনালেন। ‘ফ্লাইং গ্যাং’য়ের কাপ্তানদের বেশির ভাগই ফাঁসির দড়িতে জান খোয়ানোর বদলে তা কবুল করতে প্রস্তুত হলে গেল।

চার্লস ভেইন এ প্রস্তাবে সাড়া দিল না। ভেইনের দলে তার নিজের চেয়েও নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর জলদস্যু ছিল। কিন্তু যথাযথ প্রস্তুতির আগেই রজার্স এসে পড়ায় ঝামেলায় পড়ল ভেইন। ভেইন এবারে কালক্ষেপণের কৌশল নিল। লুট করা সম্পদ নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার পরই ক্ষমার সুযোগ গ্রহণের মতলব করল।

সে রাতে বুঝতে পারল, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সামনে মাত্র দুটি পথই খোলা—হয় আত্মসমর্পণ, না হয় লড়াই করে ভেগে যাওয়া।

এ ফাঁকে নাসাউ কী করে ‘জলদস্যু প্রজাতন্ত্র’ হয়ে উঠল, সে ইতিবৃত্ত দেখে নিই। হ্যাঁ, ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপের প্রধান বন্দরের আশেপাশের বসতির নাম বদলে নাসাউ রাখা হয়েছিল। আদিতে স্থানটির নাম ছিল চার্লস টাউন। ঔপনিবেশিক সংঘাত চলাকালে স্পেনীয়রা গোটা এলাকাকে পুড়িয়ে তামা বানিয়ে ফেলেছিল। ইউরোপের ৯ বছরের যুদ্ধের পুরো সময়ই নাসাউ দুর্বল এবং অরক্ষিত দশায়ই পড়ে রইল। সে সময় নাসাউর গভর্নর ছিলেন স্যার নিকোলাস ট্রট।

১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ জলদস্যু হেনরি অ্যাভেরি নানা সম্পদে পরিপূর্ণ ভারতীয় ‘জাহাজ গানজ-ই-সাভাই’ (ফারসি এ শব্দের অর্থ অকল্পনীয় ধন-সম্পদ) লুটপাট করে। নাম ভাঁড়িয়ে এবং উদার হাতে ঘুষ ছড়িয়ে ট্রর্টের কাছ থেকে বন্দরটিতে ঢোকার অনুমতি আদায় করল এ জলদস্যু। নাসাউর পুরুষ জনসংখ্যার থেকেও অ্যাভেরির লোক-লস্করের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি ছিল। সে সময় ফরাসিদের সাথে ইংরেজদের লড়াই চলছিল। ট্রর্ট ভেবেছিলেন, হেনরির জলদস্যুসহ এত লোক-লস্কর দেখে হয়তো ফরাসিরা নাসাউয়ে হামলা করতে সাহস পাবে না।

কিন্তু ‘গানজ-ই-সাভই’ লুটের ঘটনা ব্রিটিশ রাজ এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক চাপ আসতেদ থাকে। ট্রর্ট শেষ পর্যন্ত নাসাউ ছাড়তে অ্যাভেরিকে বাধ্য করে। অ্যাভেরিকে তার লুটপাটের মালামাল সহিসালামতেই নিয়ে যেতে দেন তিনি।

অ্যাভেরি চলে গেলেও নাসাউর কপাল খুলল না। অঞ্চলটি অরক্ষিতই রয়ে গেল। সেখানকার বসতির ওপর ধারাবাহিক হামলা অব্যাহত রইল। ১৭০১ থেকে ১৭১৪ পর্যন্ত স্পেনের উত্তরাধিকার লড়াইয়ের সময় ফ্রান্স এবং স্পেনীয় নৌবহরের হামলা চলতেই থাকল। ট্রর্ট এর আগেই দ্রুত সরে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষও এ এলাকা ছেড়ে ভেগে যায়। পরিণামে প্রাইভেটিয়ার নামে পরিচিত ভাড়াটে নৌসেনারা এবং জলদস্যুরা নাসাউয়ে আস্তানা গাড়তে থাকে।

পাইরেট শিপ ও বাণিজ্যিক জাহাজ মুখোমুখি।

যুদ্ধ চলাকালে নৌবাহিনীর খরচ কমানোর জন্য ভাড়াটে নৌসেনা বা প্রাইভেটিয়ারদের লেটার অব মার্ক দিত ইংরেজ সরকার। এই পত্রাধিকারবলে তারা ইংরেজদের শত্রুপক্ষের নিশানবাহী জাহাজে হামলা ও লুটপাটের বৈধ অনুমতি পেত। তবে লুটের ভাগ ব্রিটিশ রাজকে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতেই হতো। নটে গাছ মুড়ানোর মতোই যুদ্ধও একসময় শেষ হয়ে যায়। সাথে সাথেই লেটার অব মার্কেরও আর কোনো মূল্য থাকে না। এবারে প্রাইভেটিয়ারদের সামনে দুটো পথ খোলা রইল। হয় সব ছেড়েছুড়ে ভালো হয়ে যাওয়া, আর না হয় আইনের পথ থেকে সরে গিয়ে খাঁটি জলদস্যুর জীবন যাপন করা। বেশির ভাগই পরের পথকে নিজেদের জীবনযাপনের জন্য বেছে নেয়।

কাপ্তান বা মাঝিমাল্লার দলের সবাই দক্ষ নাবিক এবং নৌবাহিনীতে নিয়মিত কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এ সত্ত্বেও তাদের আর নৌবাহিনীর জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তৎকালীন নৌবাহিনীতে জীবনযাত্রা ছিল খুবই কঠোর এবং একঘেয়ে। সামান্য অপরাধে মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হতো। বছরের পর বছর নোনা দরিয়ায় জীবন কাটাতে হতো। নারীসঙ্গ লাভের সুযোগ প্রায় হতোই না। বিপদ-আপদ তাদের সাথে ছায়ার মতোই লেগে থাকত। অল্প বয়সে মারা যাওয়াই যেন তাদের বিধিলিপি ছিল। এত কিছুর পরও বেতন জুটত সামান্য।

১৯ শতকের ব্রিটিশ রাজকীয় নৌসেনাদের বেতন দুই বছর পর্যন্ত বকেয়া থাকত। নাবিকেরা যেন ভেগে যেতে বা বিদ্রোহ করতে না পারে, সে জন্য অন্তত ছয় মাসের বেতন বকেয়া রাখা হতো। এদিকে যুগের পর যুগ ধরে তাদের বেতনের পরিমাণ ছিল একই। ১৬৫৩ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত দেড় শ বছরে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর নাবিকদের বেতন বাড়েনি।

অন্যদিকে ভাড়াটে নৌসেনা বা প্রাইভেটিয়ার থেকে জলদস্যুতায় নাম লেখানো ব্যক্তিরা লুট করা জাহাজের সম্পদের ন্যায্য হিস্যা পেত। এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবাক করা স্বাধীনতাও ভোগ করত। অন্যদিকে নাসাউয়ের মতো জায়গা জুটলে বেশির ভাগ সময় ডাঙায় কাটাতে পারত। মদ এবং নারীসঙ্গের সুযোগ থাকত। পাশাপাশি কম বয়সে মৃত্যুর আশঙ্কা তখনো থাকত। তবে নিজের শর্তে সে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা তাদের থাকত। তাকে চোখ-কান বন্ধ করে এ ধরনের ঝুঁকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম তামিল করতে হতো না।

নাসাউর জলদস্যুদের মধ্যে যারা 'খ্যাতি'র শিখর স্পর্শ করেছিল, তাদের অন্যতম কাপ্তান বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ড এবং হেনরি জেনিংস। একসময়ে তার দুজনেই দুজনার প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাইভেটিয়ার ছিল। পরবর্তী সময়ে ভাগ্যের মোড় ঘুরে যায়। জলদস্যু প্রজাতন্ত্রের নেতা বনে যায় তারা। নিজেদের সময়ের অনেক জলদস্যুকে মেরেপিটে গড়ে তোলে বা প্রশিক্ষণ দেয়। ওস্তাদদের মতোই এসব শিষ্যের কেউ কেউ 'খ্যাতি' কুড়ায়।

হর্নিগোল্ড ১৭১৩ থেকে ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দের শীতে নাসাউয়ের কাছাকাছি সাগরে জলদস্যুর কাজে নামে। তার হুকুমের আওতায় ছিল একটিমাত্র ছোট জাহাজ। আর কয়েকটি নৌকা। ব্যস এই বহর দিয়েই নিউ প্রভিডেন্সের জলপথে যাতায়াতকারী বাণিজ্য বহরে হামলা চালাত। তিন বছরের মধ্যেই জলদস্যু বহর গড়ে তোলে। এ বহরে ছিল ৩০ কামানসজ্জিত রেঞ্জার নামে একটি জাহাজ। হর্নিগোল্ডের বহরে ছিল সাড়ে তিন শ সদস্য। এডওয়ার্ড টিচ নামের এক জলদস্যু তার ডান হাত হয়ে ওঠে। টিচ পরে ব্ল্যাকবিয়ার্ড নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

> জলদস্যু প্রজাতন্ত্রের পালের গোদা বা নেতা কিসিমের দস্যুরা সামগ্রিকভাবে 'ফ্লাই গ্যাং' নামে পরিচিত ছিল। এসব জলদস্যু তাদের গোষ্ঠী বা সমাজকে কঠিন নিয়মের নিগড়ে বাধা জাহাজি জীবনের অনুকরণে চালাত। সাগরে থাকার সময় জলদস্যুরা যেসব হুকুম মেনে চলত, এখানেও তা-ই চালানো হতো।

স্প্যানিশ লক্ষ্যবস্তুতে অবৈধ হামলার মধ্য দিয়ে ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে জলদস্যুর 'খ্যাতি' লাভ করে জেনিংস। পরে জ্যামাইকা ছেড়ে নাসাউতে পাড়ি জমায় এবং হর্নিগোল্ডের সাথে জোট বাঁধে। হর্নিগোল্ড ও জেনিংসের প্রশিক্ষিত অন্যান্য 'বিখ্যাত' জলদস্যুর মধ্যে রয়েছে চার্লস ভেন, 'ব্ল্যাক স্যাম' বেলামাই, স্টিড বোনেট এবং 'ক্যালিকো জ্যাক' র্জাকহাম। জলদস্যুর এ গোষ্ঠীকে একত্রে 'ফ্লাইং গ্যাং' নামে ডাকা হতো। তাদের দুঃসাহসিক এবং রোমহর্ষক অপরাধগুলো জলদস্যুদের কথিত 'সোনালি যুগকে' চিহ্নিত করেছে। এ গালগল্পকে কেন্দ্র করেই জলদস্যুদের কাহিনি নিয়ে বই, নাটক এবং চলচ্চিত্র তৈরিকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

জলদস্যু প্রজাতন্ত্রের পালের গোদা বা নেতা কিসিমের দস্যুরা সামগ্রিকভাবে 'ফ্লাই গ্যাং' নামে পরিচিত ছিল। এসব জলদস্যু তাদের গোষ্ঠী বা সমাজকে কঠিন নিয়মের নিগড়ে বাধা জাহাজি জীবনের অনুকরণে চালাত। সাগরে থাকার সময় জলদস্যুরা যেসব হুকুম মেনে চলত, এখানেও তা-ই চালানো হতো।

চলচ্চিত্র বা নাটকে ক্যারিবিয়ান জলদস্যুদের নিয়ে যেসব কাহিনি দেখানো হয়, তার পুরোটাই বানোয়াট বা কল্পগাথা নয়। জলদস্যু প্রজাতন্ত্রের নিশানে খুলি এবং হাড়ের ক্রুস ছিল। জলদস্যুদের নিয়মনীতি অনুযায়ী এ প্রজাতন্ত্র শাসন করা হতো। এই নিয়মনীতি জলদস্যুর সেই সমাজকে তখনকার তথাকথিত সভ্য সমাজগুলোর চেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক ও সমতাভিত্তিক করে তুলেছিল!

বারমুডার গভর্নরের মতো পড়শি ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা নাসাউ নিয়ে উদ্বেগে থাকতেন। তাদের বয়ান থেকে জানা যায়, নাসাউর দিনকাল যখন সবচেয়ে ভালো ছিল, তখন এই প্রজাতন্ত্রে এক হাজারের বেশি জলদস্যু কাজ করত। সংখ্যাটি কয়েক শ আইন মানা বাসিন্দার তুলনায় অনেক বেশি। কোনো কোনো প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ওখানে সে সময় সমসংখ্যক বারবণিতা ছিল। এদিকে মদের দোকানগুলো সব সময় রমরমা থাকত।

জলদস্যুদের এ গোষ্ঠী খুব সুসংগঠিত ছিল। তা ছাড়া নিয়মকানুন মেনেও চলত। জেনিংস 'কমোডর' হিসেবে কাজ করত। এদিকে ভয়ংকর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে আইন প্রয়োগের দায়িত্বশীল ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করা হবে কি হবে না, তা নিয়ে রেষারেষির জেরে জলদস্যু প্রজাতন্ত্রের পতনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ নিশানবাহী জাহাজে হামলা চালানোর বিরোধিতা করে হর্নিগোল্ড। এ ধরনের হামলার পরিণতি কী হতে পারে, হর্নিগোল্ডের তা ভালো করেই জানা ছিল। কিন্তু দলের অন্যান্য নাবিক ও মাঝিমাল্লারা এমন হামলার গো থেকে সরে এল না। ১৭১৬-এর নভেম্বরে হর্নিগোল্ডকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হলো। জলদস্যুরা তাদের নতুন নেতা হিসেবে বেছে নিল 'ব্ল্যাক সাম' বেলামাইকে।

জলদস্যুদের নিয়ম অনুযায়ী হর্নিগোল্ড নিজ অনুগত সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে ওই জায়গা থেকে পাততাড়ি গোটায়। বেলামাই খুব কম সময়ের মধ্যেই নাম করে। দাসবাহী ব্রিটিশ জাহাজ হুইডাহ গ্যালি দখল করাই ছিল বেলামাইয়ের জলদস্যু জীবনের চূড়ান্ত সফলতা। কেবল দাস নয়, জাহাজটিতে সোনা-রুপাও ভর্তি ছিল। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ঝড়ে বেলামাই প্রাণ হারায়।

হর্নিগোল্ডের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়। বাণিজ্য স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ আর জলদস্যু প্রজাতন্ত্রকে উপেক্ষা করেনি। এবারে তারা উডস রজার্সকে গভর্নর হিসেবে পাঠায়। নাসাউ থেকে জলদস্যুদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই।

দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রজার্স আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছালেন। রাজা প্রথম জর্জের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো–১৭১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারির মধ্যে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভালো হয়ে যাবে, তাদের মাফ করে দেওয়া হবে। এ ছাড়া জলদস্যুদের পাকড়াও করতে যারা সহায়তা করবে, তাদের মোটা পুরস্কার ব্যবস্থা করা হবে।

ব্রিটিশ এই চাতুর্যপূর্ণ ঘোষণা 'ফ্লাইং গ্যাং'-এর মধ্যে ফাটল ধরায়। ক্ষমা ঘোষণাকে মেনে নেয় হর্নিগোল্ডসহ কয়েকজন। এবার তারাই নিজেদের সাবেক সহযোগীদের পাকড়াও করার বা জলদস্যু শিকারের কাজে সহায়তা করতে থাকে। সাধারণ ক্ষমার সুযোগকে গ্রহণ করে জেনিংসও। জেনিংসের অধস্তন হওয়া সত্ত্বেও চার্লস ভেইন ক্ষমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। জলদস্যুদের অনেকে চলে যাওয়ার পরও নাসাউয়ের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভেইন। হঠাৎ করে রজার্স এসে পড়ায় তাকে নাটকীয় পদক্ষেপ দিকে ঝুঁকতে হয়।

নাসাউ বন্দর ব্রিটিশ নৌবাহিনী অবরোধ করে ফেললে বিপাকে পড়ে ভেইন। পালাবার পথ নেই। কিন্তু রাস্তা বের করে ফেলে ভেইন। লার্ক নামের একটি জাহাজে বারুদভর্তি করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। জ্বলন্ত জাহাজটি এবারে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর দিকে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। জাহাজটিতে বিস্ফোরণ ঘটলে এবারে নিজেদের জাহাজের নোঙর কেটে পালানোর আয়োজনে লেগে যায় রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো। ভেইন এ সুযোগকে কাজে লাগায়। নিজ নাবিক ও মাঝিমাল্লাদের নিয়ে দ্রুতগামী জাহাজ রেঞ্জার করে পালিয়ে যায়। পালানোর সময় নৌবাহিনীকে তাক করে বেশ কিছু গুলি বর্ষণ করে।

'ফ্লাইং গ্যাং'-এর বেশির ভাগ সদস্য হারিয়ে গেলেও ভেইন জলদস্যু পেশা থেকে সরে দাঁড়ায়নি। বাহমার জাহাজগুলোয় সুযোগমতো হামলা অব্যাহত রাখে। ভেইনের তৎপরতা রজার্সকে ভালোই বিপাকে ফেলে দেয়। ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে আবার জলদস্যু জীবনে ফিরিয়ে আনার কোশেশ করে ভেইন। এতে সফল তো হয়নি, বরং তার ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দেয়। ভেইনের মোলাকাতের পরপরই ভার্জিনিয়ার গভর্নরের পাঠানো বাহিনী ব্ল্যাকবিয়ার্ডের ওপর চড়াও হয় এবং তাকে হত্যা করে।

আর বড়সড় ফরাসি যুদ্ধজাহাজে হামলা করতে রাজি না হওয়ায় ভেইনের নাবিকেরা তার বিরুদ্ধে খেপে যায়। ১৭১৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে ভেইনের জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার জন ক্যালিকো জ্যাক জার্মহ্যাম তাকে কাপুরুষ বলে অভিযোগ করে। ভেইনকে সরিয়ে নিজেই দায়িত্ব হাতে তুলে নেয়। ভেইন ছোট জাহাজ নিয়ে সরে যেতে বাধ্য হয়। মধ্য আমেরিকার উপকূলে জাহাজডুবি হয়। বাণিজ্যিক জাহাজ ভেইনকে উদ্ধার করে। তবে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যায় এবং জ্যামাইকায় কর্তৃপক্ষের কাছে ভেইনকে তুলে দেওয়া হয়। ২৯ মার্চ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে ভেইনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

ক্যালিকো জ্যাকের পরিণতিও ভালো হয়নি। ১৭১৯-এ ক্ষমা চেয়ে নাসাউতে ফিরে আসে। এরপর রজার্সের এক নাবিকের স্ত্রী অ্যান বোনির সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটা জানাজানি হওয়ার পর একটি জাহাজ চুরি করে ফের জলদস্যু জীবনে ফিরে যায়। এবারে তার সাথে আরেক নারী জলদস্যু মেরি রিডও ছিল। কিন্তু দুজনকেই পাকড়াও করে এক জলদস্যু শিকারি। পোর্ট রয়্যালের ফাঁসিকাষ্ঠে তাদের জীবন দিতে হয়।

হর্নিগোল্ড জলদস্যু শিকারি বনেছিল। জেনিংস অবসরে চলে যায়। 'ব্ল্যাক সাম' বেলমাই, ব্ল্যাকবিয়ার্ড, ভেইন এবং ক্যালিকো জ্যাকের মৃত্যু ঘটে। সব মিলিয়ে ১৭২১-এ এসে 'ফ্লাইং গ্যাং'-এর প্রায় 'রইল না আর কেউ'। জলদস্যু প্রজাতন্ত্রকে ইতিহাসের পাতায় ঠেলে দিতে সার্থকভাবেই সক্ষম হলেন উডস রজার্স।

জলদস্যু প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো কাজ নতুন কিছু নয় রজার্সের কাছে। দুঃসাহসিক অভিযান যেন উডস রজার্সের রক্তে লেখা রয়েছে।

প্রাইভেটিয়ার হিসেবে উইলিয়াম ডাম্পিয়ারের সাথে ১৭০৮ থেকে ১৭১১ পর্যন্ত সাগর-অভিযান চালিয়েছেন রজার্স। এ সময় স্পেনীয় জাহাজ তাড়া করতে গিয়ে জনমানবহীন হুয়ান ফারেনাদেজ দ্বীপে চার বছর ধরে আটকে পড়া আলেকজান্ডার সেলকির্ককে উদ্ধারও করেন রর্জাস। সেলর্কিকের কাহিনিই ড্যানিয়েল ডিফোকে রবিনসন ক্রুসো লিখতে উদ্বুদ্ধ করে।

রজার্স এরপর বাহামাকে জলদস্যু মুক্ত করবে এবং বিনিময়ে উপনিবেশের লাভের একটা অংশ পাবে–এ রকম একটি চুক্তি করে ইংল্যান্ডের রাজ প্রথম জর্জের সাথে। ১৭২০-এ কাজে সফল হলেন রর্জাস। নিউ প্রভিডেন্সের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকেও ফিরিয়ে আনে। এত কিছুর পরও ঋণের দায়ে কারাগারে যেতে হয় রজার্সকে।

এর মধ্যে 'এ জেনারেল হিস্টোরি অব দ্য রবারিজ অ্যান্ড মার্ডারস অব দ্য মোস্ট নোটোরিয়াস পাইরেটস' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। ক্যাপ্টেন চালর্স জনসন ছদ্মনামে প্রকাশিত এ বইয়ের প্রকৃত লেখক ড্যানিয়েল ডেফো বলে মনে করা হয়। এর মধ্য দিয়ে রজার্সকে ইংল্যান্ডের জাতীয় নায়কের কাতারে নিয়ে আসা হয়। রজার্সকে রাজা দ্বিতীয় জর্জ অবসর ভাতা দেন। ফের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে নাসাউতে মারা যান রর্জাস। ●

১৬ ও ১৭ শতকে ওয়াকো জলদস্যুরা মিং ডাইন্যাস্টির জন্য বিরাট হুমকি হয়ে ওঠে।

উইলিয়াম কিড।

দুর্ধর্ষ সব জলদস্যু

একের পর এক জাহাজ লুটই ছিল যাদের নেশা

আতিক উল্লাহ

সোমালিয়ায় জলদস্যুদের হাতে বাংলাদেশি জাহাজ আটকের ঘটনা আমাদের অনিশ্চিত সমুদ্রপথের কথা মনে করিয়ে দেয়। বর্তমানের মতো অতীত জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। তবে বিশ্বজুড়ে জলদস্যুতার সত্যিকারের স্বর্ণযুগ ছিল ১৬৮৯ থেকে ১৭১৮ সাল পর্যন্ত। এ সময় ব্ল্যাকবিয়ার্ড ও হেনরি মরগানের মতো দুর্ধর্ষ জলদস্যুদের পাশাপাশি অ্যান বনি এবং মেরি রিডের মতো নারী জলদস্যুদেরও উত্থান হয়। বিপুল ধনসম্পদের মালিক হন এ জলদস্যুরা। তারা বেশির ভাগই ছিলেন নির্দয়। তবে বেলামি নামের এক জলদস্যু ছিলেন উদার। তাকে সমুদ্রের রবিনহুডও বলা হতো। তাদের বেশির ভাগকেই অবশ্য করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল।

১. বারবারোসা ব্রাদার্স

১৪৯২ সালে স্পেন যখন গ্রানাডা জয় করে তখন অভিজ্ঞ জলদস্যু হিসেবে খ্যাতি ছিল আরুজ ও হিজির নামের দুই ভাইয়ের। তারা ভূমধ্যসাগর দাপিয়ে বেড়াত। তাদের বলা হতো বারবারোসা ব্রাদার্স। ইতালিয়ান শব্দ বারবা রোসা অর্থ হলো লাল দাড়ি।

স্পেন এবং পর্তুগাল যাতে উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে কোনো অঞ্চল দখল করতে না পারে, তাই তাদের বিরুদ্ধে অটোমান সম্রাট কুরকুদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন আরুজ ও হিজির। সম্রাটের মৃত্যুর পর তারা উত্তর আফ্রিকায় আসেন এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচিতি পান।

তারা ১৫১৬ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স আক্রমণ করেন এবং এটি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অটোমান সাম্রাজ্য তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে এবং দুই ভাইকে তহবিল দেয় ও সহায়তা প্রদান করে। আরুজ আলজিয়ার্সের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং হিজির পান পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের প্রধান সমুদ্রবিষয়ক গভর্নরের পদ।

বারবারোসা ব্রাদার্স এতটাই সফল জলদস্যু ছিলেন যে খ্রিষ্টানরা তাদের পরাজিত করার জন্য হলি লীগ নামে একটি নৌবহর তৈরি করেছিল।

২. হেনরি মরগান

বিখ্যাত জলদস্যুদের মধ্যে একজন ছিলেন হেনরি মরগান। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ছিল তার 'রাজত্ব'। স্প্যানিশ জাহাজ এবং বিভিন্ন শহরে আক্রমণ করে লুণ্ঠনের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন হেনরি। স্প্যানিশ শহর পুয়ের্তো প্রিন্সিপেতে মরগান ও তার লোকদের আক্রমণের পর পুরো শহরই পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছিল। স্প্যানিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে তার আক্রমণে প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল ইংল্যান্ডের।

মরগানের শক্তিশালী জ্যামাইকান নৌবহর ছিল। লোকমুখে শোনা যায়, তিনি জলদস্যু হিসেবে তার সমগ্র জীবনে ৪০০টির বেশি জাহাজে হামলা চালিয়েছেন। স্প্যানিশ শহর ও জাহাজের পাশাপাশি তিনি ৩০টি জাহাজ ও ১২০০ লোক নিয়ে পানামা সিটিতেও অভিযান চালান।

পরে তাকে গ্রেপ্তার করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাকে ক্ষমা করে জ্যামাইকায় পাঠানো হয়। একসময় তিনি জ্যামাইকার গভর্নর হন এবং পরে একটি ছোট বাগানবাড়িতে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান।

৩. টমাস টিউ

নায়কোচিত দস্যু জীবন কাটিয়েছিলেন টমাস টিউ। তার সময়কার অন্যান্য জলদস্যুর সাথে মিলে জাহাজ লুট করতেন তিনি। বিপুল ধনসম্পদ গড়ে তোলেছিলেন। একবার একটি বড় ভারতীয় জাহাজে হামলা চালান তিনি ও তার দল। সেই জাহাজ থেকে লুট করেন প্রায় এক লাখ পাউন্ড সমমূল্যের ধনসম্পদ। এরপর এক মুঘল নৌবহরে আক্রমণ করেন তিনি। সেখানেই সংঘর্ষের মধ্যে তিনি প্রাণ হারান।

৪. হেনরি অ্যাভেরি

লং বেন নামেও পরিচিত ছিলেন হেনরি অ্যাভেরি। তিনি 'কৃতিত্বের' সাথে দ্রুত পরপর দুটি বড় জাহাজ লুট করেছিলেন। দুটি জাহাজ থেকে তিনি বিপুল ধনসম্পদ সংগ্রহ করেন। জলদস্যু হিসেবে তিনি কতটা নিখুঁত ছিলেন, সেটি তারই প্রমাণ।

তবে তিনি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন কখনোই ধরা না পড়ে। বিপুল সম্পদ লুণ্ঠনের পরে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং পালিয়ে যান। লোকমুখে তিনি কিংবদন্তি জলদস্যু হিসেবে রয়ে গেছেন।

৫. ফ্রাঁসোয়া ল'ওলানায়স

ফরাসি জলদস্যু ফ্রাঁসোয়া ল'ওলানায়স ১৬৬০-এর দশকে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে তার আধিপত্য শুরু করেন। ১৬৬৬ সালে তিনি আটটি জাহাজ এবং ৪৪০ জন জলদস্যু নিয়ে বর্তমান ভেনেজুয়েলার মারাকাইবোতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পথিমধ্যে তিনি তৎকালীন ২ লাখ ৬০ হাজার স্প্যানিশ ডলার এবং মূল্যবান রত্নপাথর, কোকো বিনসহ বিপুল ধনসম্পদে ভরা একটি জাহাজ লুট করেন।

মারাকাইবো গিয়ে তিনি শহরটি পুড়িয়ে দেন এবং ৫০০ সৈন্যকে হত্যা করেন। প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ পাওয়ার পরেও তিনি শহরটিতে লুটপাট চালিয়ে যান এবং ক্রীতদাসসহ প্রায় সবকিছুই নিয়ে যান।

তার এই বর্বরতার কথা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই জলদস্যু তার শত্রুদের চোখ বের হয়ে আসা পর্যন্ত গলায় দড়ি বেঁধে রাখার মতো নির্মমতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। ফ্রাঁসোয়া তার এক শত্রুর হৃৎপিণ্ড খেয়েছিলেন বলেও কথিত আছে। ১৬৬৮ সালে এক নরখাদক উপজাতির হাতে তিনি বন্দী হন এবং এরপর আর কখনো তার কথা শোনা যায়নি।

৬. উইলিয়াম কিড

ঠান্ডা মাথার এক খুনি ছিলেন ক্যাপ্টেন কিড। নিউইয়র্ক এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জলদস্যুমুক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। পরে তিনি নিজেই দস্যু হয়ে ওঠেন। এই পরিবর্তনের কারণ তার ক্রুদের মধ্যে বিদ্রোহ। জাহাজে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিদ্রোহ দমনে তিনি একজনকে খুন করেন। এরপর আর নৃশংসতা থেকে বের হতে পারেননি কিড।

তার সবচেয়ে সাহসী কাজটি ছিল ভারতের মালাবার উপকূলের কাছে নিজের জাহাজের প্রায় দ্বিগুণ আকারের একটি ট্রেজার জাহাজ লুট করা। কিন্তু লুটের পর তাকেই পাল্টা তাড়ার মুখে পড়তে হয়। তিনি বোস্টনের উদ্দেশে পালানোর চেষ্টা করেন। পথিমধ্যে নিউ ইংল্যান্ডের গভর্নর স্যার রিচার্ড বেলোমনি তাকে গ্রেপ্তার করে ১৭০০ সালে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন।

১৭০১ সালের ২৩ মে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তিনি একটি বেদনাদায়ক মৃত্যুর মুখোমুখি হন; কারণ, তাকে দুবার ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দড়ি মাঝপথে ছিঁড়ে যায় যায় এবং তাকে দ্বিতীয়বার ফাঁসিতে ঝুলতে হয়।

৭. এডওয়ার্ড টিচ বা ব্ল্যাকবিয়ার্ড

ব্ল্যাকবিয়ার্ড নামে পরিচিত এডওয়ার্ড টিচ জলদস্যুতা ও তার কুখ্যাত সব পন্থার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সে তার বিনুনি করা দাড়িতে স্মোকিং ফিউজ গেঁথে এবং তার বুকে অসংখ্য পিস্তল ও ছোরা ঝুলিয়ে অন্যদের ভয় দেখাতেন।

তিনি ছিলেন শয়তানের জীবন্ত মূর্তি, একজন দক্ষ যোদ্ধা এবং লুটপাটের জন্য বিখ্যাত। টিচের জলদস্যু ক্যারিয়ার তার জীবনের 'গৌরবময়' বিবরণ তুলে ধরে।

তিনি ১৭১৭ সালে একটি ফরাসি ক্রীতদাস জাহাজ দখল করেন এবং এর নামকরণ করেন 'কুইন অ্যান'স রিভেঞ্জ' নামে। জাহাজটিতে ৪০টি কামান লাগানো ছিল এবং এর সাহায্যে তিনি সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটন বন্দর অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

উত্তর ক্যারোলিনা পৌঁছানোর পর তিনি ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে নিহত হন। জানা যায়, তার শরীরে ২০ বার ছুটিকাঘাত এবং পাঁচটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস ড্রেক।

৮. ঝেং ই সাও

শেক ইয়ুং এবং চিং শিহ নামেও পরিচিত ছিলেন এই নারী জলদস্যু। এই জলদস্যু নেত্রী ১৮০১ সাল থেকে ১৮১০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ চীন সাগরে দস্যুতা করে বেড়ান। দিনি ২৬ বছর বয়সে এক জলদস্যু নেতাকে বিয়ে করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিজের দত্তক পুত্র মিলে জলদস্যু দলটির নেতৃত্ব দেন। পরে তিনি সেই দত্তক পুত্রকে বিয়েও করেন।

বারবারোসা ব্রাদার্স।

টমাস টিউ।

গুয়াংডং জলদস্যু দলের ওপর তার ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং তার বহরে ৪০০টি চীনা জাহাজ এবং ৬০ হাজার জলদস্যু ছিল তার দলে। তিনি পর্তুগিজ সাম্রাজ্য, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং এমনকি কিং রাজবংশের মতো বড় শক্তির মুখোমুখি হন।

১৮১০ সালে তিনি বিচার এড়াতে কিংরাজবংশের রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সেই সময়ে তার দলে ২০টির বেশি জাহাজ এবং ১ হাজার ৪০০ জলদস্যু ছিল। এরপর তিনি আফিম পাচারে নেমে পড়েন এবং ৬৮ বছর বয়সে মারা যান।

৯. ক্যালিকো জ্যাক

ক্যালিতো জ্যাক র‍্যাকহ্যামের নাম উল্লেখ করা ছাড়া সারা বিশ্বের জলদস্যুদের নামের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একবার তার জাহাজের ক্যাপ্টেনের ভুল সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে ঘটনাক্রমে তিনি সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন হন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের জাহাজকে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত জলদস্যু জাহাজে পরিণত করেন।

তিনি একটি মাথার খুলি, দুটি ক্রস করা তলোয়ারসহ তার বিখ্যাত জলি রজার পতাকার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। তার অধীনে মেরি রিড এবং অ্যান বনি নামের দুই নারী জলদস্যু কাজ করত। একমাত্র এই দুই নারীই ক্যারিবীয় অঞ্চলে দস্যু হিসেবে কাজ করেছেন।

তার মধ্যে অ্যান বনি ক্যাপ্টেন জ্যাকের সাথে সমুদ্রে যেতে তার স্বামীকে ত্যাগ করেছিলেন। আর মেরি রিড পুরুষ ছদ্মবেশে বিভিন্ন অপারেশনে যেতেন এবং অন্য দস্যুদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ১৭২০ সালে একটি জলদস্যু জাহাজের সাথে সাথে সংঘর্ষ হয় এবং এতে তারা প্রাণ হারান।

১৮১০ সালে তিনি বিচার এড়াতে কিংরাজবংশের রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সেই সময়ে তার দলে ২০টির বেশি জাহাজ এবং ১ হাজার ৪০০ জলদস্যু ছিল। এরপর তিনি আফিম পাচারে নেমে পড়েন এবং ৬৮ বছর বয়সে মারা যান।

বার্থলোমিউ রবার্টস।

হাওয়েল ডেভিস।

১৭১৯ সালে রুক্ষ আবহাওয়ার কারণে তিনি বে দ্বীপপুঞ্জে আটকে পড়েন। একটি ব্রিটিশ জাহাজ তাদের দেখে এবং সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ভেনের বিচার করে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১০. চার্লস ভেন

১৭০০-এর দশকের প্রথম দিকে বাহামায় সক্রিয় ছিলেন এই ইংরেজ জলদস্যু। ধনসম্পদে ভরা অনেক জাহাজে তিনি হামলা চালান। একবার তিনি বন্দী হন এবং পরে রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে তা পেয়েও যান।

কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি এবং তার লোকেরা জলদস্যুতায় ফিরে আসেন। তিনি বেশ নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন এবং হত্যা করার আগপর্যন্ত নিজের শত্রুদের তিনি নির্যাতন করে যেতেন।

১৭১৯ সালে রুক্ষ আবহাওয়ার কারণে তিনি বে দ্বীপপুঞ্জে আটকে পড়েন। একটি ব্রিটিশ জাহাজ তাদের দেখে এবং সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ভেনের বিচার করে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১১. ফ্রান্সিস ড্রেক

পুরোপুরিভাবে একজন জলদস্যু নয়; বরং ১৬ শতকে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে একজন ইংরেজ যুদ্ধজাহাজের নাবিক হিসেবে বেশি সক্রিয় ছিলেন ফ্রান্সিস। তিনি একজন প্রতিভাধর নাবিক ছিলেন। তবে ভাগ্য এতটা সদয় ছিল না তার ওপর। একসময় তিনি জলদস্যুতার জীবন বেছে নেন। ফ্রান্সিসের বুদ্ধিমত্তা তাকে মূলত জলদস্যু হিসেবে বিশ্বের কাছে বিশেষ পরিচিত করে তোলে।

১২. অ্যানি বনি এবং মেরি রিড

এই দুইজন সম্পর্কে কিছু তথ্য ওপরে বর্ণিত হয়েছে। জলদস্যু হলেও পুরুষের বিশ্বে নারী শক্তির উদাহরণ অ্যানি বনি এবং মেরি রিড।

ভাগ্য তাদের উভয়কে জলদস্যুতায় নিয়ে আসে এবং একে অপরের বন্ধু করে দেয়। সাথে নাবিক হিসেবে তাদের দক্ষতা বিশ্বের কাছে জলদস্যু হিসেবে বিখ্যাত করে তোলে।

তারা দুজনই ক্যালিকো জ্যাকের জলদস্যু দলের সদস্য ছিলেন। ধারণা করা হয় যে ক্যাপ্টন জ্যাকের সঙ্গে অ্যানির প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

কঠিন এক জীবন ছিল অ্যানি বনির। তিনি তার বাবার এক ভৃত্যের অবৈধ সন্তান ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে একটি বাগানে কাজ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়। সেখানে এক নাবিকের সাথে বনির পরিচয় হয় এবং তারা বিয়ে করেন। তিনি জলদস্যুদের সাথে মিশতে শুরু করেন এবং একসময় জ্যাকের জাহাজে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি স্বামীকে ত্যাগ করেন।

১৩. হাওয়েল ডেভিস

খুব সংক্ষিপ্ত জলদস্যু জীবন ছিল হাওয়েল ডেভিসের। নৌ পরিচালনায় দক্ষতা এবং নিজের জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজে আক্রমণ চালানোর মতো সাহসী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ক্যারিবীয় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নেন ডেভিস।

পুরো বছরজুড়ে তিনি দস্যুতা করে বেড়াতেন। কিছু উত্থান-পতনও দেখেছেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী জলদস্যুদের একজন হিসেবেই বিবেচিত হন ডেভিস।

১৪. বার্থলোমিউ রবার্টস

বুদ্ধিমান এক জলদস্যু ছিলেন বাথলোমিউ রবার্টস। ব্ল্যাক বার্ট নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি। ক্যারিবিয়ান, আফ্রিকা এবং এশিয়াজুড়ে ৪০০টির বেশি জাহাজ লুট করেছিলেন তিনি।

হাওয়েল ডেভিসের অধীনে কাজ করতেন তিনি। তবে ডেভিসের অকালমৃত্যুতে দস্যু দলের দায়িত্ব নিতে হয় রবার্টসকে। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং ঠান্ডা মাথার ব্যক্তি ছিলেন। একবার ২০টি জাহাজ লুট করে তিনি সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেন। পুরো ক্যারিবীয় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণও নিয়েছিলেন তিনি।

১৭২২ সালে রবার্টস নিহত হন। তার দুঃসাহসী কর্মজীবন তাকে জলদস্যুদের ইতিহাসে অনন্য করে তোলে।

১৫. কালো স্যাম বেলামি

ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল বেলামি ছিলেন ১৮ শতকের একজন নাবিক, যিনি পরবর্তী সময়ে জলদস্যুতে পরিণত হন। তার জলদস্যু জীবন স্বল্পকালীন হলেও সেই যুগে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ধনী জলদস্যু। মোট ৫৩টি জাহাজ তিনি লুট করেছিলেন।

অত্যন্ত নিষ্ঠুর জলদস্যু হিসেবে পরিচিত হলেও বেলামি ছিলেন উদার। তিনি সব সময় ভালো পোশাক পরতেন এবং সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। বেলামির লোকেরা তাকে বেশ পছন্দ করত এবং তাকে সমুদ্রের রবিনহুড বলে ডাকত।

১৬৮৯ সালে জন্ম নেওয়া বেলামি ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীতে একজন নাবিক হিসেবে তার সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। ভাগ্য তাকে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে আসে। তিনি ব্ল্যাকবিয়ার্ড এমনকি বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ডের সাথে কাজ করতে শুরু করেন।

১৭১৭ সালে বেলামি একটি ক্রীতদাসভর্তি জাহাজ দখল করেন। দুই মাস পরে সেই জাহাজ ঝড়ের মধ্যে ডুবে যায় এবং সেই সাথে বেলামিসহ সবাই মারা যান। ১৯৮৪ সালে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

ব্ল্যাকবিয়ার্ড আর লেঃ মেনার্ডের লড়াই।

অকুল দরিয়ায় জলদস্যুর জীবন

সালেহ ফুয়াদ

গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্রে দুর্ধর্ষ জলদস্যুদের দেখা যায়। যেভাবে দেখা যায়, সেভাবেই কি তারা জীবন যাপন করেছে? ব্ল্যাকবিয়ার্ড, ক্যাপ্টেন হুক বা অন্যদের জীবনটা কেমন? তীব্র গতিতে সমুদ্রে চষে বেড়ানো, লড়াই, লুটতরাজ–বল্গাহীন এক রোমাঞ্চকর জীবন। তাই কি? ফিকশনের কারিশমায় নিদেনপক্ষে কোমরে একটি তলোয়ার, এক জোড়া বুট, কাঁধে একটি পাখি বসিয়ে একচোখ পর্দায় ঢেকে দেওয়া জলদস্যু সরদার সাজতে ইচ্ছে হয় অনেকের। নিজেকে ক্যারিবিয়ান দীপপুঞ্জের একজন দুর্ধর্ষ পাইরেট কল্পনা করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, ফিকশনের বাইরে জলদস্যুদের জীবনের রয়েছে এক অন্য বাস্তবতা।

রূপকথার গল্প বা ইতিহাসের অনেক বইয়ে জলদস্যুদের জীবনের সত্যিকারের গল্প থাকে না। গল্প, উপন্যাস বা চলচ্চিত্রে জীবনের শুধু চমকপ্রদ দিকই জায়গা পায়। জীবনের উত্থান-পতনের অধ্যায়টি অনালোচিত থাকে। কূল-কিনারাহীন সমুদ্রে খোলা আকাশের নিচে দিনের পর দিন বাস করা কেমন, ডাকাতি না করতে পারার দিনগুলোতে মাঝদরিয়ায় খাদ্য-পানীয়ের জোগান কীভাবে হয়, বাঁচার জন্য যেটুকু নাওয়া-খাওয়া আর ঘুম প্রয়োজন, তা কি তারা পায়, এসব জানতে হলে জলদস্যুদের জীবনের 'গুড, ব্যাড অ্যান্ড আগলি' দিকগুলোতে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই। জীবনের এই অধ্যায়ে অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে বেদনা বেশি।

জলদস্যুদের উদ্ভব

খোলা জলে চুরি-ডাকাতি ও খুনখারাবিই জলদস্যুদের কাজ। এই পেশার জন্ম কবে, কোথায় হয়েছে–সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের শুরু থেকেই চুরি-ছিনতাই বা অপরাধে জড়িয়েছে। তারপর সমুদ্রে যাওয়া শেখার পর একে নিয়ন্ত্রণের কৌশল রপ্ত করেছে। ধারণা করা হয়, স্বল্প ব্যয় ও সহজ সমুদ্রপথে যখন থেকে মানুষের যাতায়াত, তখন থেকেই জলদস্যুদের আবির্ভাব। কারও কারও মতে, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জলদস্যুদের তথ্য-উপাত্ত প্রথম নথিভুক্ত হয়েছে। এজিয়ান সাগর থেকে আসা এই জলদস্যুদের বলা হতো 'সি পিওপল'। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা জলদস্যুদের শ্রেণিবদ্ধ 'সমুদ্রের মানুষ' বলে নথিভুক্ত করেছেন। এই নথিভুক্তদের দলে প্রাচীন গ্রিসের দস্যুরাও রয়েছে। মনে রাখতে হবে, এটি জলদস্যুদের প্রথম সম্ভাব্য নথিভুক্ত হওয়ার ঘটনামাত্র। যথাসম্ভব তাদের অস্তিত্ব আরও আগে থেকেই ছিল।

বিশ্বের প্রায় সব মহাদেশেই জলদস্যুদের নথিভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার জলদস্যুদের কথা লেখা রয়েছে। ইউরোপের কুখ্যাত জলদস্যু ভাইকিংদের নাম কে না জানে। এশিয়ায় ছিল মধ্যপ্রাচ্য ও চীনের জলদস্যুরা। উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দর থেকে উদ্ভব ঘটে বারবারি করসাইর জলদস্যুদের। 'গোল্ডেন এজ অব পাইরেসি'র কথা সবাই জানেন, যখন ধনসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে আসা জলদস্যুরা ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ করেছিল।

জলদস্যু কারা

জলদস্যু কারা? কেন, কীভাবে তারা জলদস্যু হয়? এর উত্তরে প্রথমেই আসে নাবিকদের নাম। সমুদ্রের অতল জলরাশিকে সবচেয়ে বেশি জানে বা বুঝতে পারে নাবিকেরা। বছরের বেশির ভাগ সময় জলের ওপর ভেসে বেড়াতে হয় তাদের। এই নাবিকেরা বুঝতে পারে প্রায় 'বিনাশ্রমে' দ্রুত অর্থবিত্ত কামাইয়ের উৎকৃষ্ট উপায় হলো সমুদ্রগামী জাহাজগুলো লুণ্ঠন করা। এই চিন্তা থেকে তারা দস্যু হয়ে ওঠে। ব্ল্যাকবিয়ার্ড এবং ক্যালিকো জ্যাকের মতো কিংবদন্তি জলদস্যু এই পেশায় আসার আগে ছিলেন নাবিক। আবার না চাইলেও অনেককে বাধ্য হয়ে জলদস্যু হতে হয়েছে। অভিযান বা লড়াইয়ে অনেক বন্দীর জলদস্যুরা দাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করত। এরা যখন বুঝতে পারত এই জীবনে আর মুক্তি নেই, তখন নিয়তি মেনে নিয়ে নিজেরাই জলদস্যু হয়ে উঠত।

জলদস্যু হওয়ার সহজ উপায় হলো বন্ধুর হাত ধরা। রাতারাতি ভরপুর ধনসম্পদ লাভের আশায় নিজের জলদস্যু বন্ধুর হাত ধরে অনেকে এ পেশায় এসেছেন। নারী হলে কোনো পুরুষ জলদস্যুকে বিয়ে করে এ পেশায় নাম লিখিয়েছেন। ক্যালিকো জ্যাককে বিয়ে করেই কুখ্যাত জলদস্যু হয়ে উঠেছিলেন অ্যান বনি। জলদস্যুদের সামান্য অংশই সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবার থেকে এসেছে। অভাব ও দারিদ্র্য ঘোচাতেই বেশির ভাগ ডাকাত খোলা জলের জীবন বেছে নিয়েছে। তবে একবার জড়িয়ে পড়ার পর অথই জলরাশির আহ্বান আর ধনসম্পদের লোভ তাদের ঘরে ফেরাতে পারেনি।

১৯ শতকের এ চিত্রকর্মে দেখা যাচ্ছে বন্দিকে শাস্তি হিসেবে কাঠের সরু তক্তায় হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে।

জলদস্যুরা কী করত

জলদস্যুদের নিজেদের সম্পদ ছিল না। ফলে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াই ছিল তাদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া তাদের জীবন অচল। দামি-স্বর্ণালংকার তারা ছিনিয়ে নিত তো বটেই, সবচেয়ে বেশি নিত মামুলি জিনিস। চাল-ডাল, রুটি। জলদস্যুরা সমুদ্রেই দিনের পর দিন ভাসতে থাকত। এ জন্য তাদের প্রয়োজন পড়ত প্রচুর খাবারের। তাজা খাবার, পানীয় এবং নৌকা বা জাহাজ চালানোর রসদ জোগাড় করায় সবচেয়ে প্রাধান্য দিত তারা। খাবারদাবার ফুরিয়ে গেলে এবং লুট করার মতো জাহাজ না পেলে উপকূলের কোনো গ্রাম বা দ্বীপে আক্রমণ চালাতেও দ্বিধা করত না। বিনোদনও আর সব জরুরি খাদ্যের মতোই একটি। ফলে শুধু বিনোদনের জন্যও তারা কখনো কখনো নির্দয় খেলায় মেতে উঠত।

জলদস্যুরা প্রচুর খেতে এবং ফুর্তি করতে পছন্দ করত। পার্টি, মৌজ-মাস্তি করতে পছন্দ করত তারা। এক রাতে সব আনন্দ উপভোগ করে ফেলার পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল। পরদিন কোন আক্রমণের মুখে পড়বে, তারা জানত না। আবার কখন ভালো খাবার পেটে পড়বে, তা-ও অনিশ্চিত। সমুদ্রে মাসের পর মাস থাকার ফলে খেতে হতো পচা-বাসি খাবার, নষ্ট পানি। জলদস্যুরা মদ খেতে পছন্দ করত। মদে বুঁদ হয়ে তারা কষ্টের দিন ভুলে থাকতে চাইত। ফলে একবার সুযোগ পেলে পার্টি সহজে শেষ হতো না।

এসব আনন্দ-ফুর্তি, অ্যাডভেঞ্চার এক পাশে সরিয়ে রেখে জলদস্যুদের মনোযোগ দিতে হতো জাহাজের দিকেও। যে জাহাজে ভর করে তারা ছুটে চলে, সেই জাহাজের মেরামত করা, পরিচ্ছন্ন রাখার কাজটি নিয়মিতই করতে হতো। ছিনতাই করা পণ্যের হেফাজত করা আরেক চ্যালেঞ্জিং কাজ।

জলদস্যুদের খাবার

ফিকশনের উসিলায় বেশির ভাগ মানুষের ধারণা হয়েছে, জলদস্যুরা যখন যা ইচ্ছা খেতে পারে। কিন্তু এই কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার বিস্তর ফারাক রয়েছে। কয়েক মাস ধরে সমুদ্রে থাকার পর খাদ্য সরবরাহ কমে যায়। হিমায়িত করে রাখার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় খাবার পচে-গলে যায়। মাংস, রুটি, দুগ্ধজাত খাবার সবই পচনশীল।

টিকে থাকার জন্য প্রায়শই খাবার চুরি করতো জলদস্যুরা, কখনো নিছক মজার জন্যও চুরি করতো।

এ কারণে প্রচুর লবণ দেওয়া মাংস বা গাজানো শাকসবজি খেতে হতো। সাওয়ার কাউট (প্রক্রিয়াজাত বাঁধাকপি), হাড়ের স্যুপ, লবণাক্ত মাংস, শক্ত রুটি–এগুলোই মূলত তাদের খাদ্য।

বুদ্ধিমান জলদস্যুরা গবাদিপশু ডাকাতি করে আনত। গরু-ছাগল রেখে তারা নিয়মিত দুধ খেত। মুরগির মাধ্যমে হতো ডিমের সরবরাহ। সব খাদ্য পচে গেলে বা ফুরিয়ে গেলে শেষ খাবার হিসেবে থাকত এসবের তাজা মাংস।

জলদস্যুদের পানীয়

জলদস্যুদের পছন্দের পানীয় কী? অবশ্যই অ্যালকোহল। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের জলদস্যুরা প্রচুর রাম খেত। দ্বীপে চাষ হতো প্রচুর আখ। রামের উৎস সেসব আখ। বিয়ারও তাদের প্রিয় পানীয়। কখনো অন্য জাহাজে আক্রমণ করে আনতে পারলে ব্রান্ডি, ওয়াইনও জুটত। যেকোনো ধরনের অ্যালকোহল পেলে ওরা চুরি-ছিনতাই করতে ছাড়ত না। ছবিতে জলদস্যুদের সোনাদানা চুরি করতে দেখা যায়। বাস্তবে ওরা মদের জন্য হীরা-জহরতও ছাড়তে রাজি।

মনে হতে পারে, সি-ফুড বুঝি জলদস্যুদের প্রিয় খাবার। বাস্তবে ওরা বড়শি নিয়ে মাছ ধরার ফুরসত পেত খুব কম। এক কামড় পুষ্টিকর খাবার জোগাড়ের জন্য দিনভর মাছ ধরাকে ওরা নির্বোধের কাজ মনে করত। তবে বৈরী সময়ে সবকিছুই যে করতে হতো, তাতে সন্দেহ নেই। প্রধানত ওরা অন্য জাহাজ থেকে লুট করে নিয়ে আসা খাবারই খেত।

জলদস্যুদের গোসল ও ঘুম

ক্যাপ্টেন বা নিদেনপক্ষে ক্রদের মধ্যে হোমরাচোমরা কেউ হলে কেবিন পাওয়া যেত ঘুমানোর জন্য। নয়তো আরও অনেকের সঙ্গে খোলা কোনো জায়গায় মাথা পাতার জায়গা মিলত জলদস্যুদের। তবে বেশির ভাগই মেঝের তুলনায় হ্যামকে (দড়ি বা কাপড়ের দোলনার মতো বিছানা) ঘুমানোকে প্রাধান্য দিত। ঢেউয়ের তালে তালে দোলার কারণে ঘুমে সুবিধা হয় এতে।

জলদস্যুদের পরিচ্ছন্নতা

জলদস্যুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কোনো ব্যবস্থা বা গরজ কোনোটাই ছিল না। একে তাদের কাছে পানির সুবিশাল মজুত থাকত না। যা থাকত, তা শুধু পান করার জন্য। তাই অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন জীবন বা গায়ের দুর্গন্ধ নিয়ে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। প্রাচীন নথিপত্রে উল্লেখ আছে, জলদস্যুরা সমুদ্রের পানিতে নামত। তবে তা গোসলের জন্য নয়। গা ঠান্ডা করার জন্য। দুর্গন্ধ নিয়ে তারা থোড়াই কেয়ার করত। এবং দাঁত ব্রাশ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করত না।

তাজা খাবার, পর্যাপ্ত পানি পান, গোসল করা, মলমূত্র থেকে পরিষ্কার থাকা এবং গভীর ঘুমের চিন্তা আমরা করতে পারি সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু জলদস্যুদের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পরিবার থেকে বহুদূরের দীর্ঘদিনের সফরে তাদের এসব নিয়ে ভাবার সুযোগ নেই।

অসুস্থতা ও মৃত্যু

জলদস্যুরা সাধারণত দীর্ঘ জীবন পেত না। দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি, অসুস্থদের স্পর্শে আসা, অনাহার, বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া, শরীরের পানিশূন্যতা ইত্যাদি কারণে তারা দ্রুত মারা যেত। অন্য জাহাজে ডাকাতি করতে গিয়ে আহত বা নিহত হয়ে মৃত্যু ঘটা সাধারণ বিষয়। লড়াই মানেই তলোয়ারের কোপ বা বন্দুকের গুলি কারও না কারও গায়ে লাগা। কখনো গভীর ক্ষত নিয়ে ফিরে আসতে হতো। রক্তক্ষরণ বা ক্ষতের সংক্রমণ তাদের ঘায়েল করে ছাড়ত। কখনো জাহাজের দিকে ছুটে আসত কামানের গোলা, কখনো তীব্র ঝড়ে পড়ত জাহাজ, কখনো পাথরে আঘাত লেগে উল্টে যেত, এসবের কারণে স্বল্পায়ু হতো জলদস্যুরা। আর ধরা পড়লে? ঝুলিয়ে দেওয়া হতো ফাঁসিতে। আক্ষরিক অর্থেই তখন তারা হতো পাখির খাবার।

জলদস্যুদের জন্য সবচেয়ে প্রাণঘাতী রোগ ছিল স্কার্ভি। এ রোগে ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যায়। পিঠ বেঁকে যায়। চামড়ায় দাগ পড়ে। মাড়ি ফুলে যায়। চুল ও দাঁত ক্ষয়ে যায়। চলাফেরায় অস্থিরতা তৈরি হয়। এই রোগটা হয় খাবারে ভিটামিন সি-এর অভাবে। কয়েক মাস সমুদ্রে থাকার কারণে ভিটামিন সি-যুক্ত খাবারের ঘাটতি তৈরি হয়। এতে শরীরে স্কার্ভি বাসা বাঁধে। একসময় এটাই হয় মরণব্যাধি।

আমাশয় আরেকটি সাধারণ 'জলদস্যু রোগ'। দূষিত খাবার এবং নোংরা পানি খাওয়ার কারণে এটি হয়। জলদস্যুদের অনেক জাহাজেই এই রোগের আলামত পাওয়া গেছে। ●

ব্ল্যাক বিয়ার্ড।

হর্নিগোল্ডের বিচিত্র জীবন–ছিল জলদস্যু, হলো জলদস্যুশিকারি

আমিল বতুল

জলদস্যু সরদারের আওতায় সাধারণভাবে কয়েকটি জাহাজের একটি বহর থাকে। হর্নিগোল্ড এর ব্যতিক্রম নয়। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তার চেলা ইংরেজ জলদস্যু এডওয়ার্ড টিচকে দলের দ্বিতীয় সরদার বা উপপ্রধান বানায়। তখনো তার 'খ্যাতি' নিয়ে গালগল্প তেমন একটা শোনা যায়নি। হর্নিগোল্ডের এই ইংরেজ চেলা পরবর্তীকালে ইতিহাসে ব্ল্যাকবিয়ার্ড হিসেবে স্থান করে নেয়।

ব্রিটিশ জলদস্যু বেঞ্জামিন হর্নিগোল্ডের চারণক্ষেত্র ছিল মধ্য ক্যারিবিয়ান এবং উত্তর আটলান্টিক। ১৭১৬ থেকে ১৭১৭ পর্যন্ত তৎপরতা চালিয়ে গোটা এলাকাজুড়ে 'নাম' (নাকি 'দুর্নাম') কিনেছিল। তবে তার সবচেয়ে বড় পরিচয়, ব্ল্যাকবিয়ার্ড (মৃত্যু ১৭১৮) নামে পরিচিত এডওয়ার্ড টিচকে জলদস্যুবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এই হর্নিগোল্ড। শিষ্যের নামেই এভাবে ওস্তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নেয়। সরকারি ক্ষমা ঘোষণার সুযোগে হর্নিগোল্ড জলদস্যুগিরি ছেড়েছুড়ে ভালো হয়ে যায়। এতটাই ভালো হয়ে যায় যে বাহামার সরকার হর্নিগোল্ডকে অন্যান্য জলদস্যুকে পাকড়াও করতে অর্থাৎ জলদস্যু শিকারে নিয়োগ করে। এ দায়িত্ব ওস্তাদির সাথেই পালন করে হর্নিগোল্ড। ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে জাহাজডুবির পর একটি জনমানবহীন দ্বীপে বেঘোরে প্রাণ হারায় হর্নিগোল্ড।

'এ জেনারেল হিস্টোরি অব দ্য রবারিস অ্যান্ড মার্ডারস অব দ্য মোস্ট নটোরিয়াস পাইরেটস' বইটি প্রকাশিত হয় ১৭২০-এর দশকে। চালর্স জনসনের নামে বইটি প্রকাশিত হলেও আসল লেখক ড্যানিয়েল ডাফো, বলা হয়। এই বইয়ে হর্নিগোল্ডের কাহিনি তুলে ধরা হলে 'খ্যাতিমান' জলদস্যু হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া জলদস্যুদের বিচারসংক্রান্ত নথিপত্র ঘেঁটে বাহমার গভর্নরের পক্ষ নিয়ে তার জলদস্যুশিকারিতে রূপান্তরের জীবনপর্ব সম্পর্কে জানা গেছে।

কথিত জলদস্যুর সোনালি যুগে অন্যান্য জলদস্যুর মতো হর্নিগোল্ডের আস্তানা গড়ে উঠেছিল বাহামার নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপে। স্পেন এবং পর্তুগিজ জাহাজে হামলা চালানোর অনুমতি তাকে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ভাড়াটে নৌসেনা বা প্রাইভেটিয়ার হিসেবে এভাবেই জলদস্যুজীবনের হাতেখড়ি হয় তার। ১৭১৩ থেকে ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই জলদস্যু হিসেবে নিজের শিকড় পোক্ত করে ফেলে। বাহামার এ আস্তানা জলদস্যুদের ডেরা হিসেবে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। ধান্ধাবাজ ব্যবসায়ীরা এখানে জড়ো হতো জলদস্যুদের লুটের মালামাল জুতসই দামে কেনার মতলবে। অন্যদিকে এখানেই ডাঙার জীবনের দুই 'মদ-নারী' নিয়ে মেতে উঠতে আর গানের হুল্লোড়ে গা ভাসিয়ে দিতে পারত জলদস্যুরা।

হর্নিগোল্ডের চেলাচামুন্ডা জলদস্যুদের অনেকেই পরে বেশ 'নামধাম' কামিয়েছিল। এদের একজন হলো স্যামুয়েল বেলামাই (মৃত্যু ১৭১৭)। আট কামান বসানো দখল করা জাহাজ মেরি অ্যান এই সুযোগ্য শিষ্যকে উপহার দিয়েছিল হর্নিগোল্ড। বেলমাইয়ের মতো জলদস্যুদের গুলিতে বা ফাঁসিতে মৃত্যুই স্বাভাবিক হলেও তার বরাতে তেমন মরণ জোটেনি। বরং কেপ কডের কাছে ঝড়ে মারা যায় বেচারা। হর্নিগোল্ডের আরেকজন 'খ্যাতিমান' সহযোগী হলো ফরাসি জলদস্যু অলিভিয়ার লা বুশ।

জলদস্যু সরদারের আওতায় সাধারণভাবে কয়েকটি জাহাজের একটি বহর থাকে। হর্নিগোল্ড এর ব্যতিক্রম নয়। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তার চেলা ইংরেজ জলদস্যু এডওয়ার্ড টিচকে দলের দ্বিতীয় সরদার বা উপপ্রধান বানায়। তখনো তার 'খ্যাতি' নিয়ে গালগল্প তেমন একটা শোনা যায়নি। হর্নিগোল্ডের এই ইংরেজ চেলা পরবর্তীকালে ইতিহাসে ব্ল্যাকবিয়ার্ড হিসেবে স্থান করে নেয়।

টিচ আগের বছরই বাহামায় হর্নিগোল্ডের জলদস্যুর দলে যোগ দেয়। ছিনিয়ে আনা ছোট একটা জাহাজের সরদার বা কাপ্তান বানিয়ে দেওয়া হলো তাকে। এরপর হর্নিগোল্ড এবং টিচ একযোগের জলদস্যুবৃত্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্যারিবিয়ান এবং উত্তর আমেরিকার উপকূলজুড়ে যাতায়াতকারী জাহাজে হামলা এবং লুটপাটে বড় ধরনের সাফল্য পেতে থাকে দুই জলদস্যু সরদার। হর্নিগোল্ড এবং টিচ সহযোগী হিসেবে ডাকাতি চালাতে থাকে। দুজনের নিজ নিজ ডাকাতির মালের সমান ভাগ অপরকে দিত। হয়তো হামলার সময় একজনের জাহাজ অকুস্থলেই ছিল না। তাতেও ভাগ পেতে কোনো অসুবিধা হতো না। কিউবা, বারমুডা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর আমেরিকাগামী অনেক জাহাজ তাদের শিকার হয়েছে। মদের পিপে বা ময়দার পিপের মতো নিত্যপণ্য কিন্তু দামি হিসেবে বিবেচিত মালামালও লুট করত এই দুই জলদস্যুরা।

ফরাসি বাণিজ্যিক জাহাজ কনকর্ড আফ্রিকার নানা বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে স্বর্ণ রেণু, মুদ্রা, রত্ন এবং অন্যান্য মূল্যবান পণ্য নিয়ে মার্টিনিকে যাওয়ার পথে হর্নিগোল্ড এবং টিচের শিকারে পরিণত হয়। ১৭১৭-এর দিকে সেন্ট ভিনসেন্টের কাছাকাছি এ জাহাজকে কবজা করে টিচ। লুটের পণ্যগুলো টিচ, হর্নিগোল্ড এবং তাদের দলের জলদস্যুদের মধ্যে ভাগ করা হয়। দখল করা জাহাজটি নাম বদলে কুইন অ্যানস রিভেঞ্জ রাখে টিচ। এতে ৪০টি কামান বসায়। ফলে কুইন অ্যানস রিভেঞ্জ নৌবাহিনীর অনেক জাহাজের মতোই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদিকে টিচ এরই মধ্যে ব্ল্যাকবিয়ার্ড নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কুইন অ্যানস রিভেঞ্জকে ডাকাতির কাজে লাগিয়ে ওস্তাদকে ছাড়িয়ে যায়। হর্নিগোল্ডের চেয়েও দুর্ধর্ষ জল-ডাকাত সরদার হয়ে ওঠে।

এর কিছু পরেই দুজনে দুটি পথ বেছে নেয়। ঝগড়া-বিবাদ বা রেষারেষি না করে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ব্ল্যাকবিয়ার্ড উত্তর আমেরিকার সাগরে ডাকাতিতে চলে যায়। অন্যদিকে *এরপর পৃষ্ঠা ১৩*

সন্দেহভাজন সোমালি জলদস্যুরা পাল্টা জলদস্যু অভিযানের সদস্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। ছবি: জেসন আর জালাস্কি/ইউএস নেভি।

বিপৎসংকুল সোমালি জলসীমা

২ পৃষ্ঠার পর

এমভি জাহান মনিতে হামলা করেছিল জলদস্যুরা। একই বছরের ১১ মে সোমালি জলদস্যুরা এডেন উপসাগরে একটি বুলগেরিয়ান পতাকাবাহী জাহাজ ছিনতাই করেছিল। পানেগা নামের জাহাজটি ১৫ জন বুলগেরিয়ান ক্রু সদস্য নিয়ে লোহিত সাগর থেকে ভারত বা পাকিস্তানে যাচ্ছিলেন। এটি ছিল বুলগেরিয়ান পতাকাবাহী জাহাজের প্রথম ছিনতাইয়ের ঘটনা।

২০১১ সালের ১৪ জানুয়ারি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় রয়্যাল নেদারল্যান্ডস নৌবাহিনীর কমোডর মিশেল হিজম্যানস বলেছিলেন, সাম্প্রতিক ছিনতাই করা জাহাজ ব্যবহারের মাধ্যমে জলদস্যুরা তাদের পরিসর বাড়িয়েছে এবং অপহৃত নাবিকদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এ বছর জলদস্যুরা সোমালি জলসীমা, ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ২১২টি হামলা চালিয়েছিল।

২০১২ সালে সোমালি জলদস্যুরা ৩৪টির মতো জাহাজে হামলা চালায় ও ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর প্রচেষ্টা, জাহাজে সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং সোমালিয়ায় স্থলভাগে উন্নয়নের জন্য সোমালি জলদস্যুদের আক্রমণের হার ২০১২ সালে হ্রাস পেয়েছিল। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর (আইএমবি) তথ্য অনুসারে, ২০১২ সালের অক্টোবরে মধ্যে জলদস্যুদের আক্রমণ ছয় বছরের মধ্য সর্বনিম্নে পৌঁছেছিল। ২০১১ সালের একই সময়ে জলদস্যুরা ৩৬ টি জাহাজে হামলা চালিয়েছিল।

২০১৩ সালের ডিসেম্বর নাগাদ মার্কিন নৌ গোয়েন্দা অফিস রিপোর্ট করেছিল, জলদস্যুরা মাত্র নয়টি জাহাজ আক্রমণ করেছে এবং কোনো সফল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেনি।

২০১৭ সালের ১৩ মার্চ পুন্টল্যান্ডের সোমালিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শহর আলুলা থেকে কয়েক মাইল দূরে জলদস্যুরা এরিস ১৩ জাহাজটি ছিনতাই করেছিল। ২০১২ সালের পর এটিই ছিল বড় বাণিজ্যিক জাহাজের প্রথম ছিনতাইয়ের ঘটনা। জাহাজটি জিবুতি থেকে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে তেল নিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় দুই ডজন সশস্ত্র জলদস্যু জাহাজটি ছিনতাই করেছিল।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোমালিয়ার উপকূল থেকে ১৬০ নটিক্যাল মাইল (৩০০ কিমি) দূরে জলদস্যুরা লেপার্ড সান জাহাজে গুলি চালিয়েছিল। জাহাজের নিরাপত্তা দল পাল্টা গুলি চালালে জলদস্যুদের জাহাজটি পালিয়ে যায়। ২০১৭ সালের নভেম্বরের পর এই এলাকায় এটিই প্রথম জলদস্যু হামলা বলে ধারণা করা হয়েছিল।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সোমালি জলদস্যুদের আক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় ভারত মহাসাগর হাই রিস্ক এরিয়া (এইচ) তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইএমবি সতর্ক করে বলেছিল, সোমালি জলদস্যুদের এখনো এডেন উপসাগরীয় অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করার সক্ষমতা এবং জনবল রয়েছে।

ন্যাটো কমান্ডের অধীনে কাজ করা ডাচ নৌবাহিনী দ্বারা বন্দী সন্দেহভাজন সোমালি জলদস্যুরা। ছবি: জোসেফ ওকাঙ্গা (রয়টার্স)

২০০৫ সাল থেকে জলদস্যুতার জন্য ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি সোমালি যুবক বিদেশে বিভিন্ন কারাগারে বন্দী রয়েছেন। বেশির ভাগই যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ২০১৫ সালে আল-জাজিরাকে জানিয়েছিল, প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন 'জলদস্যু এবং সন্দেহভাজন জলদস্যু' ২১টি দেশের আদালতে বা কারাগারে রয়েছে। ●

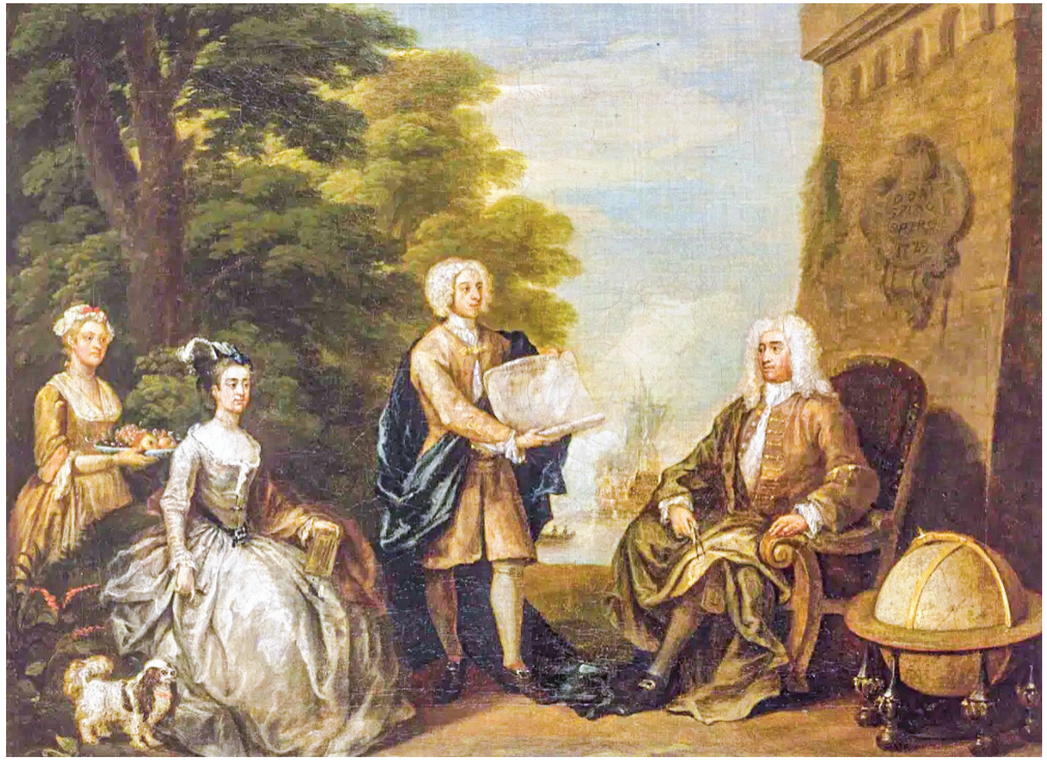

উড রজার্স, বাহামার গভর্নর।

হর্নিগোল্ডের বিচিত্র জীবন–ছিল জলদস্যু, হলো জলদস্যুশিকারি

১১ পৃষ্ঠার পর

হর্নিগোল্ড ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে চালিয়ে যায় ডাকাতি। ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর দুই জাহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৭১৮ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হওয়ার মাধ্যমে দস্যুসুলভ মৃত্যু ঘটে ব্ল্যাকবিয়ার্ডের।

জলদস্যু সর্দার হর্নিগোল্ড রাজক্ষমার পুরো সুযোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে সাগরে ডাকাতির ঘটনাবলিকে খুব গ্রাহ্য করেনি মার্কিন উপনিবেশ এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অনেক গভর্নর এবং কর্মকর্তা। কেউ কেউ নিজেরাই এসব তৎপরতায় জড়িত ছিল। জলদস্যুদের মালামাল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে সস্তায় কেনা যেত। তাতেই অনেকে খুশি ছিল। ১৭১০-এর দশকের শেষ ভাগে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছিল। সাগরে ডাকাতি, জলদস্যুর তৎপরতা বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার এবং সৎ ব্যবসায়ীদের দলবল গভর্নরদের ওপর চাপ দিতে থাকে। এ কারণেই ব্রিটিশ রাজা প্রথম জর্জ (শাসনামল ১৭১৪ থেকে ১৭২৭) জলদস্যুদের জন্য রাজক্ষমা ঘোষণা করেন। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বরে এ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়েছিল, যারা জলদস্যুবৃত্তি ত্যাগ করবে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। জ্যামাইকার গভর্নর পিটার হেওয়ার্ডের পাঠানো একটি জাহাজের মাধ্যমে হর্নিগোল্ড এ ঘোষণা সম্পর্কে জানতে পারে। রাজক্ষমাকে গ্রহণ করবে জানিয়ে ভুল বানানে চিঠি দেয় হর্নিগোল্ড।

১৭১৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে হর্নিগোল্ড বাহমার গভর্নর উডস রজার্সের (১৬৭৯-১৭৩২) কাছ থেকে ক্ষমা গ্রহণ করে হর্নিগোল্ড। একই সাথে নতুন করে জীবন শুরু করবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেয়। জলদস্যুরা ভালো মানুষ হতে শুরু করলে তার ফল বাহামার জন্য মোটেও ভালো হয় না। জলদস্যু দল নেই, নেই চোরাই মালের ব্যবসা। উপনিবেশগুলোর কাছে বাহমা নিজ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। পরিণামে খোদ রজার্সই দেউলিয়া হয়ে যায়।

জলদস্যু দলের সবাই রাজক্ষমা গ্রহণ করেনি বা ডাকাতি ছেড়েছুড়ে সাদামাটা জীবনে ফিরে আসেনি। কিন্তু সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে স্বাভাবিক জীবনে যে ফিরে এসেছে, হর্নিগোল্ড তা প্রমাণ করার সুযোগ পায়। জলদস্যুদের মধ্যে যারা রাজক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করেনি এবং ডাকাতি পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছিল, তাদের ধরার জন্য বা জলদস্যুশিকারি হিসেবে হর্নিগোল্ডকে নিয়োগ দেন গভর্নর রজার্স। ইংরেজ জলদস্যু চার্লস ভেইন গভর্নরের প্রথম লক্ষ্যে পরিণত হয়। ১৭১৮ সালে নিউ প্রভিডেন্স বন্দর থেকে ভেগে যাওয়ার সময় রজার্সের জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল। ভেইন দ্রুতগামী জাহাজ ব্যবহার করত। তাকে তাড়া করা হর্নিগোল্ডের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কপালের ফেরে ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে ভেইনের জাহাজডুবি ঘটে। ডুবে মরার হাত থেকে উদ্ধার পেলেও তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। পরের বছর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এবারে জন অগার বা অগর নামের এক জলদস্যুকে পাকড়াও করার দায়িত্ব হর্নিগোল্ডকে দেওয়া হয়। অগার তখন তিন সরবরাহকারী জাহাজ ছিনতাই করেছিল। এসব জাহাজ নিউ প্রভিডেন্স থেকে ছিনতাই করা হয়। এর আগে অগার রাজক্ষমা লাভ করেছিল। কিন্তু তারপরও জলদস্যু জীবনের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রাজক্ষমাকে অবজ্ঞা করে সে আবার জলদস্যুর জীবনে ফিরে যায়। তার এ কর্মকাণ্ডকে রাজক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার হিসেবে গণ্য করা হয়। গভর্নর রজার্স এ কারণে অগারকে উদাহরণমূলক শাস্তি দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। অগারকে তাড়া করার জন্য একটি জাহাজের নেতৃত্ব দেয় হর্নিগোল্ড। অপর জাহাজ ছিল ক্যাপ্টেন ককরামের নিয়ন্ত্রণে। লং আইল্যান্ডে অগারের জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। সে ধরা পড়ে।

অগারসহ কয়েকজন জলদস্যুকে পাকড়াও করে নিউ প্রভিডেন্সে ফিরে আসে হর্নিগোল্ড। জলদস্যুদের রেহাই দেওয়া হবে না। তাদের আটক করা হবে এবং বিচারের মুখোমুখি করা হবে। নিজের এ সিদ্ধান্ত ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ পায় রজার্স। নাসাউতে তাদের বিচার হয়। বিচারে নেতৃত্ব দেন রজার্স। বিচারে ১০ জলদস্যুর মধ্যে ৯ জনকেই প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। অনেক সাক্ষী এবং আলামত থাকার পরও জলদস্যুরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে। ছাড়া পায় শুধু জন হিপস নামের এক জলদস্যু। এ জলদস্যু বিচারকদের বোঝাতে সক্ষম হয়, জলদস্যু দলে সে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছিল।

অগারকে পাকড়াও করতে সফলতা লাভ করায় হর্নিগোল্ড গভর্নর রজার্সের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। মেক্সিকোর বিভিন্ন বন্দরের সাথে বাণিজ্য করার জন্য হর্নিগোল্ডকে পাঠানো হয়। এই সফর হর্নিগোল্ডের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। হর্নিগোল্ডের জাহাজ একটি ডুবো প্রবালপ্রাচীরের সাথে ধাক্কা খায়। হর্নিগোল্ডসহ কয়েকজন জনমানবহীন দ্বীপে আটকা পড়ে। তাদের মধ্যে পাঁচজন একটি ক্যানো তৈরি করে পালাতে পারলেও হর্নিগোল্ড আটকাই থেকে যায়। শেষ অবধি নির্জন দ্বীপটিতে প্রাণ হারায় হর্নিগোল্ড। বার্থোলোমিউ রবার্টসের মতো জলদস্যুদের পর্যায়ে সফলতা অর্জন করেনি হর্নিগোল্ড। তারপরও মানুষ তাকে ভুলে যায়নি। মানুষের কল্পজগতে এখনো তার স্থান রয়েছে। তারা আছেন ভিডিও গেম অ্যাসাসিনস ক্রিড ওঃ ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ এবং টিভি শো ব্ল্যাক সেইলসে। ●

বিলি বোনসের ভূমিকায় টম হপার।

জলদস্যুর জাহাজ

কাপ্তান থেকে খালাসি–ঘাম ঝরাত সবাই

সৈয়দ মূসা রেজা

চলচ্চিত্র দেখে বা বই পড়ে চট করে মনে হতে পারে, জলদস্যু হইতাম থাকতাম সুখে! যখন-তখন জাহাজ লুট করে হাতিয়ে নেওয়া যেত হিরে-জহরত। তারপর বুনো উৎসবে মেতে উঠতে বাধা দেওয়ার আর কেউ ছিল না। কথাটা আংশিক সত্য। বাকি অংশ ঘাটতে গেলে মিলবে কেবল কঠোর পরিশ্রম। ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি এনসাইক্লোপেডিয়ায় এ নিয়ে আরও লিখেছেন মার্ক কাটরাইট।

জলদস্যুদের প্রথম পরিচয় তারাও নাবিক। জলদস্যুর সোনালি যুগে (১৬৯০-১৭৩০) জাহাজ চালানোর জন্য দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। একই সাথে জাহাজসহ সাজসরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণেও ঘাটতি হওয়ার উপায় ছিল না। জলদস্যুকে দক্ষ নাবিক হতেই হবে। তাড়া করে বাণিজ্য জাহাজ পাকড়াও করা। কিংবা সাগরের বুকে দ্রুত ধাবমান সশস্ত্র নৌবাহিনীর জাহাজের কবল থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষ নৌচালনার ফলিতবিদ্যার বিকল্প কিছুই ছিল না। ১৭ বা ১৮ শতকের সাগরগামী জাহাজের তনদুরস্তির জন্য জলদস্যুর জাহাজের কাপ্তান থেকে খালাসি পর্যন্ত সবারই গতর খাটাতে এবং হাতে হাতে মিলিয়ে কাজ করতে হতো।

জলদস্যু জাহাজের কাপ্তানই প্রায় সময়ই সব অভিযানের নীলনকশা করত। জলদস্যুকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে তার অতীত খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, হয়তো জাহাজটি সেই কিনেছে। বৈধভাবেই জাহাজের কাপ্তানের পদ পেয়েছে। ভাড়াটে নৌসেনা বা প্রাইভেটিয়ারের জাহাজের কর্মকর্তা ছিল। জলদস্যুরা তাদের জীবনে স্বাধীনতাকে সবচেয়ে প্রিয় করে তুলেছিল। অবাধ স্বাধীনতার জোরেই বেশির ভাগ জলদস্যু-জাহাজের কাপ্তানকে নির্বাচন করত জাহাজের নাবিকেরা। হরদম মাতব্বরি বা মেজাজ দেখায় এ রকম কাপ্তানকে মোটেও পছন্দ করত না জলদস্যুরা। বাণিজ্যিক জাহাজ বা নৌবাহিনীর কঠোর জীবনযাত্রা থেকে মুক্তির শ্বাস নেওয়ার আশায় অনেকে জলদস্যুর ঢুকেছিল।

এ কথাও ঠিক, জলদস্যুদের জাহাজেও নানা আইনকানুন থাকত। বার্থলোমিউ রবার্টসের (১৬৮২-১৭২২) মতো সফল জলদস্যু কাপ্তানরা নিজেদের জাহাজে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে সবাইকে বাধ্য করত। তার নেতৃত্বাধীন জাহাজে জুয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কাপ্তান পদকে চিরস্থায়ী বলে ধরে নেওয়া ঠিক হতো না। 'খ্যাতিমান' জলদস্যু চার্লস ভেইন ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে হামলা করতে অস্বীকার করেছিল। তার জাহাজের নাবিকেরা তা সুবোধ বালকদের মতো মেনে নেয়নি। বরং তার বিরুদ্ধে কাপুরুষতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ভেইনকে সরিয়ে 'ক্যালিকো জ্যাক'কে কাপ্তান বানানো হয়। ভেইন পরবর্তীকালে জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পেলেও ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাকে।

কাপ্তান

সোনালি যুগের জলদস্যু কাপ্তানরা নজরকাড়া পোশাক-আশাক পরত। আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দাড়িতে রিবন লাগাত ব্ল্যাকবিয়ার্ড। টুপি থেকে ঝুলিয়ে রাখত ধীরলয়ে জ্বলন্ত তিন-তিনটা মোটা দড়ি বা ফিউজ। এতে মাথার চারপাশে সৃষ্টি হতো ধোঁয়াশা। মানুষটিকে দৈত্য-দানব বা অতিপ্রাকৃতিক চেহারাধারী কিছু বলে মনে হতো। লড়াইয়ের আগে দুশমনের মনের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল হিসেবেই এ কাজ করত ব্ল্যাকবিয়ার্ড। অন্যদিকে জলদস্যু কাপ্তান রবার্টস পরত লাল সিল্ক, পাখির পালকের টুপি এবং হিরের নেকলেস। সফল জলদস্যু নেতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল লম্বা কোট এবং দামি পিস্তল। নেতৃত্ব, নৌচালানোর দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্বের জন্য অন্যদের তুলনায় লুটের দ্বিগুণ বখরা জুটত কাপ্তানের। সাধারণ জলদস্যু ধরা পড়লে তার ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কা থাকত। কিন্তু কাপ্তান ধরা পড়লে ফাঁসিতে ঝোলা প্রায় নিশ্চিতই ছিল। এদিকে কাপ্তান কিডের (১৭০১) মতো দুর্ধর্ষ জলদস্যু সরদার ধরা পড়ার পর কেবল ফাঁসি দেওয়া হয়নি। অন্যদের প্রতি হুঁশিয়ারি হিসেবে তার লাশও শিকলে বেঁধে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শিকল বাধা অবস্থায়ই তার লাশ পচে-গলে কঙ্কাল হয়ে থেকেছে।

কোয়াটারমাস্টার

জলদস্যু জাহাজে কাপ্তানের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো কোয়াটারমাস্টার। জাহাজ ঠিক পথ ধরে চলছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব কোয়াটারমাস্টারের। নাবিকদের তদারকিরও ভার তার কাঁধেই থাকত। হামলার নেতৃত্ব দেওয়া, জলদস্যুদের শিকার হয়েছে এমন জাহাজ থেকে কী কী লুটপাট করতে হবে, তা-ও ঠিক করা ছিল কোয়াটারমাস্টারের কাজ। লুটের মালামাল সাধারণ নাবিকদের মধ্যে সমভাবে ভাগের ব্যবস্থাও তাকেই নিতে হয়। অন্যদিকে কাপ্তানের মতোই তার ভাগে লুটের মালামাল সাধারণ নাবিকদের তুলনায় দ্বিগুণই জুটত। নাবিকেরা যদি কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভোট দিত, তবে তা-ও কার্যকর করত কোয়াটারমাস্টার। জলদস্যু-কাপ্তান যদি আরেকটি জাহাজ দখল করতে পারত, তবে সচরাচর নতুন জাহাজের কাপ্তানের পদের ছিকাও ছিঁড়তে পারত তারই বরাতে।

নেভিগেটর

জলদস্যুর জাহাজে অনেক সময়ই বিশেষজ্ঞ নেভিগেটর বা সাগরপথ সন্ধানীকের রাখা হতো। জাহাজের কাপ্তান এবং কোয়াটারমাস্টার সাগরপথে চলাচলের দুর্গম কাজ অবশ্যই জানে। তবে এ কাজে একজন বিশেষজ্ঞকে বসানো হলে বেশি সুফল মেলে। মানচিত্র, তটরেখা, বাতাসের গতি এবং আবহাওয়াসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা নেভিগেটরের থাকে। সে যুগে দ্রাঘিমাংশ নির্ভুলভাবে মাপা সহজ ছিল না; তাই এ কাজের জন্য অভিজ্ঞতার বিকল্প ছিল না। সাগরপথ নির্ণয়ে ঝানু ব্যক্তিরই কেবল সঠিকভাবে ব্যবসায়ী জাহাজের চলাচলের পথ ভালোভাবে জানা থাকত। গোপনে কোথায় ওত পেতে থাকতে হবে বুঝতে পারত। কোন পথে ঝুঁকি রয়েছে, তারা টের পেত। এমন সব কাজে রহস্যময় দক্ষতার জন্য কখনো কখনো নেভিগেটরকে সম্মান দেখিয়ে শিল্পী নামেই ডাকা হতো।

সারেং বা বোটসওয়েন (বোসুন)

সারেং বা বোটসওয়েনকে (বোসুন) জাহাজ চালানোর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাল, পালসংক্রান্ত দড়াদড়ি এবং নোঙরের মতো সাজসরঞ্জাম ঠিকঠাক আছে কি না, দেখার দায়িত্ব তার। সাধারণ নাবিকের তুলনায় লুটের দেড় গুণ অংশ জুটত তার। বড় বড় জাহাজে সারেঙের সহযোগী থাকত। বোসুন মেট বা সারেং সহযোগী নামে ডাকা হতো তাদের।

কর্মকর্তা

জলদস্যু জাহাজে নির্দিষ্ট পদবি না থাকলেও অভিজ্ঞ নাবিকেরা নেতা হিসেবে কাজ করত। সাধারণ নাবিক বা মাঝিমাল্লাদের দৈনিকের কাজগুলো সংগঠিত করা তার দায়িত্বের অংশে পরিণত হতো। সাধারণ নাবিকদের তুলনায় কর্মকর্তারা লুটের মালামালের এক-চতুর্থাংশ অংশ বেশি পেত।

ডাক্তার এবং কাঠমিস্ত্রি

জলদস্যু জাহাজের ডাক্তার থাকলে সুবিধার শেষ নেই। কিন্তু সে রকম ঘটনা একেবারেই বিরল। ডাক্তারহীন অবস্থায় জাহাজের কাপ্তানকেই সবার অসুখ-বিসুখ সারাবার জন্য জাহাজের ওষুধের বাক্সের ওপর নির্ভর করতে হতো। চোট সামলানোর কাজে জরুরি পরিস্থিতিতে কাঠমিস্ত্রির সহায়তাও নিতে হতো। গুরুতর অস্ত্রোপচারের কাজটি করত কাঠমিস্ত্রি।

সাধারণভাবে জাহাজ মেরামত করাই ছিল কাঠমিস্ত্রির প্রধান দায়িত্ব। ঝড়, শত্রুর আক্রমণ বা সামুদ্রিক প্রাণীর হামলায় জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে তোলার কাজই করত কাঠমিস্ত্রি। এদিকে জলদস্যুরা যদি কোনো নতুন জাহাজ দখল করত, তাকে দ্রুততর করে তোলা এবং প্রয়োজনে জলদস্যুদের উপযোগী করে শক্তিশালী করার জন্য পরিবর্তন ঘটত কাঠমিস্ত্রির হাতে। জাহাজে কামান বসানোর ব্যবস্থা করা, বাড়তি ওজন কমানোসহ আরও কিছু কাজ করতে হতো। দক্ষ কাঠমিস্ত্রি বেশির ভাগ সময়ই স্বেচ্ছায় যেত না। তাকে জোরজবরদস্তি করে জাহাজের সঙ্গী করা হতো। সাধারণ নাবিকের তুলনায় লুটের মালের দেড় গুণ পেত সে।

পিপে নির্মাতা এবং পাল নির্মাতা

পিপের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাহাজের নানামুখী পাত্র হিসেবে কাজে লাগানো হতো পিপেকে। এতে শুকনো খাবারদাবার রাখা হতো। পানি রাখা হতো। রাম এবং বারুদও রাখার জন্য ব্যবহার হতো পিপে। পিপেতে যেন বাতাস না ঢোকে। যথাসাধ্য পানিরোধীও করা হতো। জাহাজে পাল নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। বিশেষ করে সংঘর্ষের সময় এ ক্ষতির মাত্রা বাড়তে পারত। এই পাল ঠিক রাখা, ছিঁড়ে যাওয়া পালকে সেলাই করাসহ নানা কাজ করতে হতো পাল নির্মাতাকে। তার সেলাইয়ের বিদ্যায় দক্ষতাকে অন্যভাবেও কাজে লাগানো হতো। শল্যচিকিৎসক না থাকায় জাহাজের নাবিকদের ক্ষত সেলাই করার জন্য পাল নির্মাতাকে স্মরণ করতে হতো। পালের জাহাজের যুগে পাল নির্মাতাকে প্রধান প্রকৌশলীয় ভূমিকা পালন করতে হতো।

গানার

জলদস্যু জাহাজের কামানচালকদের গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিত গানার। তার সহযোগীকে গানার মেট বলা হতো। জলদস্যু জাহাজের একটি কামান চালাতে ৪ থেকে ৬ জন লাগত। নানা মাপের গোলা ছোড়া হতো। কতটা দূরে ছোড়া হবে, গোলার মাপ এবং ওজন অনুযায়ী কামানে বারুদপূর্ণ করতে হতো। লক্ষ্যবস্তু সাধারণভাবে চলমান থাকত। এসব বিবেচনায় নিয়ে কামান দাগার সিদ্ধান্ত নিতে হতো গানারকে। এদিকে জলদস্যুরা কখনোই চাইত না বাণিজ্যিক জাহাজের মারাত্মক ক্ষতি হোক। তাতে জাহাজের মালামালের ক্ষতি হবে। আখেরে জলদস্যুদের লাভও কমে যাবে। সংঘাতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে জলদস্যুর জাহাজের কামানচালককেও নানা কাজ করতে হতো। একজন সাধারণ নাবিকের তুলনায় গানার লুটের মালামালের ভাগ দেড় গুণ বেশি পেত।

রাঁধুনি

জলদস্যুরা সাধারণভাবে আটক জাহাজের খাবারদাবার সাবাড়ে দিত। ডাঙায় থাকার সময় মদ্যশালায় খাবারের কাজ সারত। কিন্তু সাগরে শিকার তাড়া করার সময়টিতে রাঁধুনির দরকার পড়ত। রাঁধুনির কাজ সাধারণভাবে করত অভিযানে অঙ্গ হারানো জলদস্যু। জলদস্যুদের এ বিষয়টি রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের নজর এড়ায়নি। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রকাশিত ট্রেজার আইল্যান্ডে দেখা যায় লং জন সিলভার জলদস্যু হওয়ার আগে রাঁধুনির কাজ করেছিল।

যন্ত্রশিল্পী

সব ধরনের জাহাজ এমনকি জলদস্যুদের জাহাজেও বেহালাবাদক এবং শিঙাবাদক থাকত। দড়ি টানা বা পাল তোলার সময় কাজে ছন্দ আনার জন্য তারা বেহালা বাজাত বা শিঙা ফুঁকত। টাইটানিক যখন ডুবছে, বাদকদল তখনো বাদ্য বাজিয়ে তুলছে–চলচ্চিত্রটির এ দৃশ্যের কথা অনেকেরই মনে উঁকি দিতে পারে। এদিকে আক্রমণের সময়ও ভয়াল পরিবেশ তৈরির জন্য যন্ত্রশিল্পীরা তৎপর থাকত। এ ছাড়া জাহাজের নাবিকদের ইচ্ছাতে বিনোদন দেওয়ার জন্যও তৎপর হতো যন্ত্রশিল্পীরা।

সাধারণ নাবিক

জলদস্যুর খাতায় কারা নাম লেখাত? সাধারণ নাবিক হতো কারা? সাবেক নৌসেনা, প্রাইভেটিয়ার নামে পরিচিত ভাড়াটে নৌসেনা সাধারণভাবে জলদস্যু হয়ে উঠত। এদিকে জলদস্যু জাহাজের সাধারণ নাবিকের বেশির ভাগই ছিল বিদ্রোহী, বন্দী নাবিক এবং কম বেতন কিন্তু কঠিন কিংবা শক্ত কাজে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে আসা লোকজন। দুঃসাহসিক সাগরজীবনের টানেও কিছু তরুণ বয়সী ছেলে যোগ দিত। আর যোগ দিত পালিয়ে আসা কিছু দাসও।

ক্যারিবিয়ানের সোনালি যুগের জলদস্যু দলে বিভিন্ন দেশের লোকজন পাওয়া যেত। বেশির ভাগই ব্রিটিশ বা মার্কিন উপনিবেশ থেকে আসা মানুষ ছিল। দাস বিশেষ করে কালো দাসদের জাহাজ চালানোর কোনো অভিজ্ঞতা থাকত না। তাদের দিয়ে কায়িক শ্রমের কাজ করানো হতো। কিন্তু জলদস্যুদের বিচারের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে সময়ের সাথে সাথে দাসদের মধ্যে কেউ কেউ জাহাজ চালানোর কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছে। দলের অন্যদের সাথে পাল্লা দিতে পারত তারা।

কিসের টানে মানুষ জলদস্যুর জীবনের দিকে ঝুঁকত? ভালো খাবারদাবার। ভালো দান মারতে পারলে একবারেই কয়েক বছরের সমপরিমাণ কামাই। লালসা মিটিয়ে মদ্যপান, স্বাধীনতা এবং দুঃসাহসিক তৎপরতায় ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ। নিজে কিছু করছি এ বোধটুকুও তৈরি হতো। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এবং লুটের মালামাল ভাগাভাগির সময়ে সবার মতামত নেওয়া হতো। বলা যায়, গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বিরাজ করত।

পাশাপাশি এ জন্য মূল্যও কম দিতে হতো না। ঝুঁকিও কম ছিল না। কারান্তরালে জীবন কাটানোর আশঙ্কা, ফাঁসির মতো চরম শাস্তির মুখোমুখি হওয়া কিংবা মারাত্মকভাবে আহত হওয়া। জলদস্যু পেশার গড় মেয়াদ দুই বছর। চরম কথাটি হলো, একবার জলদস্যুর জীবনে নেমে পড়লে পরিবারের সাথে জন্মেও দেখা না হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যেত।

ক্যাপ্টেন কিড নিউ ইয়র্ক হার্বারে।

গোলাপী এখন কোথায়?

সরওয়ার পাঠান

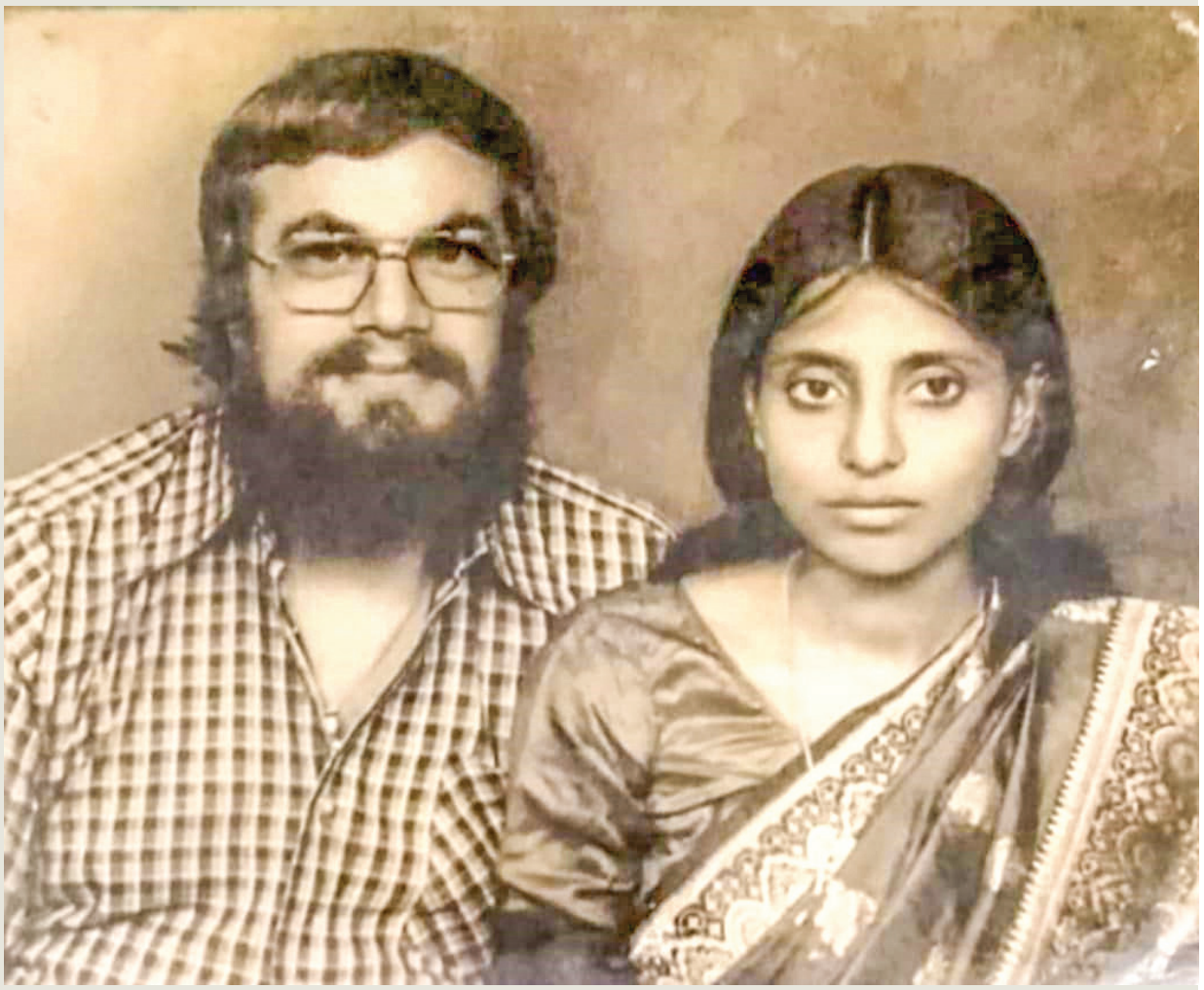

মিস্টার বুকেট ও গোলাপী।

মিস্টার বুকেট, আমি ৩১ বছর ধরে ভাবছি আপনার গোলাপীকে নিয়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন প্রকৌশলী হিসেবে আপনি কর্মরত ছিলেন, সময়টা ১৯৮০ সাল। ডিসেম্বরে হঠাৎ আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ভর্তি করা হয় মহাখালীর একটি হাসপাতালে। সেখানেই আপনার পরিচয় ঘটে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট গোলাপীর সাথে। সে নিয়মিত আপনার সেবা-শুশ্রূষা করত। আর এভাবেই ছিপছিপে শ্যামলা বর্ণের সেই দীর্ঘাঙ্গিনী তরুণী আপনার মন জয় করে নেয়। ভালোবাসা আর প্রেমের গণ্ডি পেরিয়ে আপনারা একসময় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দীঘল চোখের সুভাষিনী গোলাপী আপনার জীবনসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়।

নরসিংদীর চরসিন্দুর ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের দরিদ্র মেয়েটির জীবন অপার ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে। আপনার সংস্পর্শে তার জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন চলে আসে। আগে থেকেই সে একটু স্বাধীনচেতা ধরনের ছিল। আর আপনার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর সে টি-শার্ট আর জিনস প্যান্ট পরে মুখে ডানহিল সিগারেট নিয়ে অজপাড়াগাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, মুক্ত পাখির মতো। গ্রামের অনেকেই এটা পছন্দ করত না। তবে রক্ষণশীল এক জনগোষ্ঠীর বিপরীতে গোলাপী যেন ছিল এক মূর্তিমান প্রতিবাদ, তীব্র স্রোতের প্রতিকূলে এগিয়ে চলা এক সাহসী যোদ্ধা।

বিদ্যুৎবিহীন সেই আদি গ্রামে ছিল গোলাপী আর বুকেটের ডাকবাংলো। রাত্রিবেলায় সেখানে জেনারেটরের সাহায্যে জ্বলে উঠত বৈদ্যুতিক আলো। কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে ঘুরে বেড়াত দুটো জার্মান শেফার্ড কুকুর। ছিল ভিনদেশি বিড়াল, যার গলায় ছিল সোনার চেইন। কুকুর আর বিড়ালদের খাওয়ানো হতো প্যাকেটজাত খাদ্য। এসব বিষয় ছিল গ্রামের মানুষের চিন্তারও অতীত। গ্রামের মানুষের প্রবল আগ্রহ আর কৌতূহলের কেন্দ্র ছিল ওই বাংলোবাড়িটি। তাদের ব্যবহৃত নিশান জিপটি দাঁড় করানো থাকত বাংলো থেকে কিছুটা দূরে। এক রাতে ওই জিপের জানালার কাচ ভেঙে বুকেট সাহেবের কয়েক বোতল সিভাস রিগ্যাল আর বিয়ারের কার্টন চুরি করে নিয়ে যায় গ্রামের কয়েকজন যুবক। এ নিয়ে ভীষণ তোলপাড় শুরু হয় সমস্ত এলাকাজুড়ে। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে সেই কথা।

বুকেট সাহেব, আপনি কয়েক বছর পর গোলাপীকে নিজ দেশ পশ্চিম জার্মানিতে নিয়ে যান। কিছুদিন পর সে ফিরে এল, তবে আপনাকে ছাড়া। জানা গেল, কিছুদিন পর আবার সে আপনার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু সেই যাওয়া আর হলো না।

সাহেব, আপনি কি জানেন পরবর্তী সময়ে আপনার গোলাপীর জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল? নানা রকম ষড়যন্ত্র আর মামলা-হামলায় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে গোলাপীর জীবন। প্রবল দারিদ্র্য এসে গ্রাস করে তাকে, ডানহিল সিগারেট বদলে যায় আলাউদ্দিন বিড়িতে। প্রবল ঝড়ে পথ হারানো পাখির মতো বিভ্রান্ত হয়ে ছুটতে থাকে সে গ্রাম, শহর, বন্দরে। গা ভাসিয়ে দেয় বিপথগামী প্লাবনে।

তারপর একদিন (১৯৯৩) গোলাপী বাড়ি ছেড়ে রওনা হয়ে যায় ভারতের উদ্দেশে। তখন শুনেছিলাম ভারত থেকে পশ্চিম জার্মানিতে যাওয়ার চেষ্টা করবে সে। এরপর কী ঘটেছে জানা নেই। তবে তার আর দেশে ফিরে আসা হয়নি। ৩১ বছর অতিবাহিত হতে চলেছে।

আজ থেকে দেড় দশক আগের কথা। আমি তখন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত বন্য প্রাণী সম্পর্কে লিখে যাচ্ছি। অনেকে তখন ভাবতেন আমি কোনো পত্রিকাতে চাকরি করি। বেশির ভাগ সময় আমি ঢাকাতেই থ াকতাম। মাঝেমধ্যে বাড়িতে এলে গোলাপীর অন্ধ মা জোহরা কাজী, সবাই যাকে বইচা নামে চিনত, প্রায় সময়ই আমার কাছে আসতেন। একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে দিশেহারা মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতেন, 'বাবা আমার মাইয়ারে নিয়া পত্রিকায় লেখো, আমার মাইয়ারে আইন্যা দাও।'

তারপর একবার গোলাপী আর মিস্টার বুকেটের একটি যুগলবন্দী আলোকচিত্র নিয়ে আসেন। ছবিটি তাদের বিয়ের এক বছর পরে তোলা। নানাবিধ কারণে এই বিষয়টা নিয়ে লেখা হয়ে ওঠেনি। আসলে অনেকের মতো আমিও ভেবেছিলাম, গোলাপী হয়তো জার্মানিতে আছে বুকেট সাহেবের কাছে।

গোলাপীর অন্ধ মা, সুলতানপুর কাজীবাড়ির বইচা মেয়ের শোকে কাঁদতে কাঁদতে একসময় মরে গেল। ৩১ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আজও কেউ গোলাপীর খবর জানে না। একটা মানুষ এত সময় ধরে নিরুদ্দেশ, নিঃসন্দেহে অত্যন্ত রহস্যময় ঘটনা। তবে এ বিষয়ে আমার মাথায় শুধুই দুটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায়।

মিস্টার বুকেট, আপনি কেন গোলাপীর সঙ্গে এমন করলেন?

গোলাপী এখন কোথায়? গোলাপী জার্মানী পৌঁছাতে পেরেছিল? ●